KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication 28, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x 9.5" 17.78x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৩/- ৩/- ৩/- ৩/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ শ্রাবণ, ১৩৬২ ভাদ্র, ১৩৬২ কার্ত্তিক, ১৩৬২
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর — নারায়ণ চৌধুরী

তৃতীয় বর্ষ শারদীয় ১৩৬২

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

তৃতীয় বর্ষ শারদীয় ১৩৬২

অবনীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা ১৭

প্রবন্ধ

সাবেকী কথা : অসিতকুমার হালদার ১৯
আফ্রিকার কথা : অন্নদাশঙ্কর রায় ৪১
শরৎসাহিত্যের ভূমিকা : রথীন্দ্রনাথ রায় ৪৬
মণিপুরী নৃত্য : শ্রীমতী ঠাকুর ৬১

কবিতা

আশাবরী : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ২৩
অভিযোগ : গোপাল ভৌমিক ২৪
অসম্ভব : সরযূপতি সিংহ ২৬
বৃষ্টি : সরিৎ শর্মা ২৭
পাণ্ডুটে আকাশ : সন্তোষ দাস ২৮
আরেক পৃথিবী : লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ৩০
বেহালা : কৃতান্তনাথ বাগচী ৩১
সৌন্দর্যের দৃষ্টি : চার্লস বোদলেয়র (অনুবাদ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৩২

গল্প

এ জন্মের স্বপ্নভঙ্গ : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩
সৎকার : রণজিৎকুমার সেন ৫৩
একটি প্রাক্‌-শারদীয় কাহিনী : ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৬৪
গ্রন্থি : দক্ষিণারঞ্জন বসু ৬৯

পরিচালক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

অবনীন্দ্রনাথের রচনাটি শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

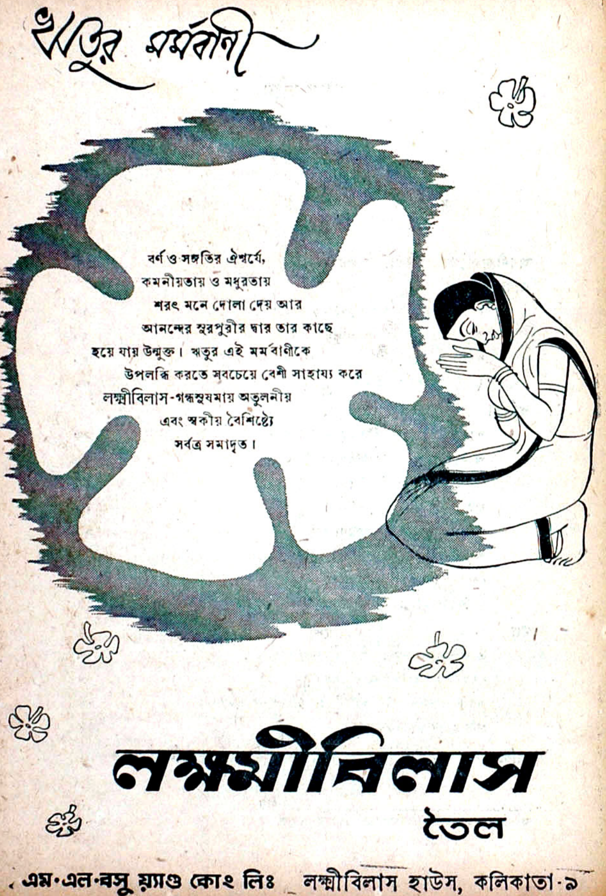

সমকালীন
তৃতীয় বর্ষ, শারদীয়, ১৩৬২

পরবশ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সবাই নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিচ্ছে—এই হল স্বাভাবিক অবস্থা সকল রকম জীব ও জন্তুর পক্ষেই। নিজের বাসা নিজে বাঁধা, নিজের খাবার নিজেই সংগ্রহ করা, নিজেকে নিজে রক্ষা—এ এক কালে মানুষকেও করতে হয়েছে, ইতর জীবের মতই। তারপর ক্রমে মানুষ নিজের যা কিছু করবার তা পরের উপরে নিক্ষেপ করে করে চলেছে জীবন যাত্রার পথ যতটা পারে স্বচ্ছন্দ করতে চেয়ে। এর ফলে মানব সমাজ থেকে আরম্ভ করে মানুষের জন্যে নগর, গ্রাম, ক্ষেত, বাণিজ্য, ব্যবসায় কত কি এল। একজন খাবার সংগ্রহ করলে—আর একজন মূল্য দিয়ে কিনলে খাবার, একজন খাটলে অন্যজন দাম দিয়ে খাটিয়ে নিলে, একজন পয়সা ঢাল্‌লে অন্যজন এসে তার বাসা বেঁধে দিলে, কাপড় বুনে দিলে, খাদ্য রেঁধে দিলে, দেবতার মত রথে চড়িয়ে তাকে এখানে ওখানে টেনে নিয়ে বেড়ালে, এবং মরে গেলে নগদ মূল্য নিয়ে তার সদগতি করে এল। এই যে প্রকাণ্ড একটা পরাপেক্ষিতার ছাঁচের মধ্যে মানুষ আপনাকে ঢেলে দিয়ে সব বিষয়ে অক্ষমতাকে বরণ করলে তার দ্বারায় হল এই যে স্বেচ্ছা ও স্বমত বলে একটা কিছু মানুষের রইল না। ইচ্ছাই রইল না নিজের বাসা বাঁধতে, নিজের কাপড় বুনতে, নিজের খাবার নিজে রাঁধতে। নিজের যা করবার তা ভুলতে ভুলতে মানুষ এক একটি "বাচ্ছা ভোলানাথ" হয়ে উঠলো এমন যে সে কল্পনাই করে রচনা করে না, গড়া জিনিষ ভাঙ্গে, ছেঁড়ে, ক্ষয় করে, কিন্তু গড়ে না কিছু, জোড়া লাগায় না কিছু, সঞ্চয় করতে চলে না কিছু।

পরের মুখ চাওয়া পরাধীন অবস্থার চেয়ে আরো এক ধাপ নীচাবস্থা। দায়ে পড়ে

পাখি পরাধীন—কিন্তু খাঁচার ফাঁক দিয়ে গলে সে আত্ম-নির্ভরকে খুঁজতে এক একবার চেষ্টা করে এবং ভুল করে অনেক সময়ে সে খাঁচার রক্ষা-কবচটা পরিত্যাগ করে মরেও। কিন্তু পরাপেক্ষি পোষ্য কবুতর ছাড়া পেয়েও উড়ে পড়ে না। পালকের বাঁধা খোপে বাচ্চা ফোটায় মাত্র। অনেক সময় সেটুকু করা থেকেও পালক তাকে মুক্তি দেয়—দয়া করে তাপযন্ত্রে দিম ফুটিয়ে নিয়ে। পরাধীনের নিজের ইচ্ছা আছে কিন্তু ইচ্ছা চরিতার্থ করার উপায় নেই। আর পরাপেক্ষির, সে বেচারার নিজের ইচ্ছা বলে একটা বালাই নেই—উপায় হাতে থাকা সত্ত্বেও।

সাবেকী কথা

অসিতকুমার হালদার

আমার প্রথম চলিত-ভাষায় বাঙলা প্রবন্ধ লেখার কথা বলতে গিয়ে নদিদিমার (স্বর্ণকুমারী দেবীর) ভারতী-কুঞ্জের কথা বলতে হবে। অজন্তার বিষয় প্রবন্ধ লেখার পর নদিদি আদেশ দিলেন গুরুদেব অবনমামার বিষয় ভারতীতে একটি প্রবন্ধ লিখতে। রবিদাদাদের কাছে উৎসাহ পেয়ে স্ফীত অন্তরে আবার কেতাবী বাঙলায় না লিখে চলিত বাঙলায় প্রবন্ধটি লিখলাম। ছাপা হয়ে যখন বেরুলো, দেখলাম সহকারী সম্পাদক ভাষা গুরু-চণ্ডালী দোষদুষ্ট মনে ক'রে কেতাবী বাঙলায় সম্পাদন ক'রে ছেপেছেন। সেই প্রবন্ধর সঙ্গে আমাকে লেখা অবনমামার একটি চিঠিও বেরিয়েছিল। কিন্তু যখন সেই ভারতীতেই জোরালো চলিত ভাষায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখতে আরম্ভ করলেন, তখন থেকে ভাষার মোড় ফিরে গেল চলিত ভাষার দিকেই। ইংরাজী ১৮৫২ সালে আমার পিতামহ রাখালদাস হালদার তাঁর "উত্তরাধিকারীর প্রতি উপঢৌকন" নামক বাঙলায় লিখিত রোজনামচা খাতায় বাঙলা ভাষার এই সমস্যার বিষয় যা লিখেছিলেন তা বল্লে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

"বাঙলা ভাষার ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় কি? কতকগুলিন লোক কেবল সংস্কৃত রচনারীতি ভালবাসেন, কতকগুলিন কেবল গ্রাম্যবাঙলা রীতি ভালবাসেন, কতকগুলিন কেবল ইংরাজী রচনা-রীতি ভালবাসেন। ফলতঃ যাঁহারা বাঙলা ভাষার নূতন নূতন রচনারীতি প্রবিষ্ট করিতে ভীত হয়েন, তাঁহারা অতি অবিবেচক। আমার মত এই যে এই ভাষায় যত নব নব রীতি সমাবেশিত করা যাইবে, এভাষার ক্ষমতা তত বৃদ্ধি হইবে। ইংরাজী ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নানা গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছে, এবং ইংরাজেরা নানা ভাষা শিক্ষা করিয়া স্বীয় ভাষায় গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। সেই কারণেই এক্ষণে ইংরেজী ভাষার ক্ষমতা এত চমৎকারিণী হইয়াছে।"

পিতামহের লেখা এই কথাগুলিও আমায় চলিত ভাষায় লেখার পথ দেখিয়েছিল পরোক্ষভাবে। নদিদিমা (স্বর্ণকুমারী দেবী) আমাকে প্রথম সুযোগ দেন ভারতী পত্রিকায় অজন্তার বিষয় লিখতে ব'লে। নদিদির কথা পূর্বে বলা হলেও আরো কিছু না ব'লে থাকতে পারছি না। তাঁর আমার প্রতি ছিল অহৈতুকী বিশেষ ভালবাসা তা ভোলবার নয়। নদিদির ভাই বোন এবং নিজের মিলিয়ে নাতি নাতনীর সংখ্যা কম ছিলনা। কিন্তু তথাপি আমার উপর তাঁর স্নেহ অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রতি শনিবারে ৪৪ নং বেনেপুকুরে গাড়ী পাঠিয়ে আমাকে নিজের কাছে আনাতেন। তাঁর কাছে বসে বসে ছবি আঁকতুম, বই পড়তুম। একদিন আসতে দেরী হ'লে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন তিনি। একটি পত্রে তাঁর সেই ভালবাসা বেশ ফুটে আছে।

স্নেহাস্পদেষু,—তবু মনে পড়েচে, সেই ভাল।

আমার মনে তো চির জাগরূক রয়েছ—।

সে কি ভোলা যায়—কেমনে ভুলি,
আধেক নয়নে মুখ তুলে চাওয়া
ধীরে ধীরে হেসে মনো-কথা কওয়া
ছবিটি আঁকিতে প্রেম গান গাওয়া
মোহন আঙ্গুলে ধরিয়া তুলি।

হায়! সে ভুলেছে—আমি কেমনে ভুলি।

......................তোমার নদিদিমা।

মাঝে মাঝে নদিদির অন্যান্য ভাইয়েদের মত রবিদাদাও তাঁর বাড়ীতে (বালিগঞ্জ সানিপার্কে) আসতেন। নদিদির কাছে আমাকে দেখে সহাস্যে বল্‌তেন—"ও, তাই অসিত আমার দিকে বেশী আসে না, তুমি নাতিটিকে কলাকোবিদ জেনে দেখচি ভুলিয়ে রেখেচ?" কলাকোবিদ কথাটি রবিদাদা প্রায়ই আমাকে আরোপ করতেন। চিঠির খামেও আমাকে এই পদবী দিয়ে সম্বোধন করতেন। পোষ্টকার্ডের লেখা ঠিকানায় এখনো তার চিহ্ন আছে। নদিদির ভারতীতেই আমার প্রথম কবিতা ছেপে বেরিয়েছিল। তিনি এইভাবে আমাকে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করেছিলেন। নতুবা হয়ত কেবল একটা পটুয়া হয়েই থেকে যেতাম। চিত্রকলায় পরিকল্পনার পরিসরও খর্ব হ'ত। মৎ-রচিত প্রথম কবিতা "কবির নৈরাশ্য" ১৯০৮।৯ সালের ভারতীতে বেরিয়েছিল:

শব্দ-কল্প-তরু হ'তে করি আহরণ
চারুতর কথাগুলি করিয়া চয়ন,
সুপ্রয়োগে রচি তাহে জানাই তোমায়
এ মোর হৃদয়াবেগ বড় ইচ্ছা হায়!
—কিন্তু নারি প্রকাশিতে বিন্দুমাত্র তার
শব্দগুলি ভেঙে পড়ে শতচূর্ণ ধার!

ভারতী কুঞ্জে তখন নদিদির বাড়ী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকরাও অনেকে আসতেন। তারমধ্যে মণিলাল গাঙ্গুলি এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান। তাঁরা তার কিছুকাল পরেই 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনার গুরুভার নদিদির কাছ থেকে নেন।

নদিদির বাড়ীতে ছিল দেশী-বিলাতি সংস্কারের সমাবেশ। নদাদা মহাশয় (শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল) ফুলদান সাজানো টেবিলে hotplateএর উপর ন্যাপকিন নিয়ে ডিনার-জ্যাকেট পরে খানসামার হাতে খেতেন। বিলাতি 'টেবিল এটিকেট' তাঁর নিকট ছোটবেলায় শিখেছিলাম। তাঁদের সঙ্গে থেকে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হ'তো। তারক পালিতের বাড়ী, ডক্টর পি, কে রায়ের বাড়ী, ত্রিপুরার বড়ঠাকুরের বাড়ী নানাবিধ party, fancy dress tableau হ'তো, আমাকে সেসময় স্টেজসজ্জা, নটনায়িকাদের সাজসজ্জা থেকে নিয়ে

অভিনয় প্রভৃতিও শেখাতে হ'তো। একবার ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুলে প্রিয়ম্বদা দেবী, লেডি বোস, নদিদি, বিবিমাসী প্রভৃতি সাবিত্রী সত্যবান tableau করলেন বড়লাট-পত্নীর স্কুলে শুভ আগমন উপলক্ষ্যে-আমাকে যেতে হয়েছিল তার সব তদারক করতে। সাবিত্রী ও সত্যবান যে দুটি মেয়ে সেজেছিলেন তাঁদের কথা মনে আছে, সাবিত্রী যিনি, তিনি দেশী কায়দায় যমকে নমস্কার করায় অভ্যস্থ নন। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মেয়েদের নমস্কার শেখাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। একদিকে আমি ছিলাম শৈশব থেকে পিতার সঙ্গে বাঙলা দেশের নানান জেলায় ঘোরা পাড়াগাঁয়ে মানুষ, আর শিক্ষা পেয়েছিলাম গ্রাম্য রীতিতে বামুনদিদির কাছে। মুখে মুখে ছড়া কেটে গ্রামে ছেলেমেয়েদের মেয়েরা যে ভাবে শিক্ষা দেন, ভারতবর্ষে অন্য কোথাও সেরূপ নেই। শৈশবের কোমল অন্তকরণে সেসব কথা গ্রথিত হয়ে আজও আছে। এই গ্রাম্য শিক্ষার প্রণালীর ভিতরও ভাল জিনিষ অনেক আছে। "অতি বড় হয়োনা ঝড়ে পড়ে যাবে,—অতি ছোট হয়োনা ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।" "খেতে জান্‌লে মরেনা, বসতে জানলে নড়েনা।" বা "আপ্‌চ (অপচয়) করলে আলিক্ষির (অলক্ষীর) দশা হয়।" ইত্যাদি বহু ছড়ার ভিতর যে শিক্ষা-তত্ব নিহিত আছে তা পণ্ডিতদের লেখা দুরূহ স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে নেই। আবার নদিদিমা খাঁটি কথায় আমাকে কখনো কখনো সারবান উপদেশ দিয়ে বলতেন "গয়ংগচ্ছ করিসনে"—"দীর্ঘসূত্রতা ভাল নয়"—"যাদৃশী-র্ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতী তাদৃশী।" শিল্পকলা-শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন আমার উন্নতি বাংলার পল্লীগ্রামের পোটেদের নিকট পট এবং অজন্তার ক্লাসিকাল শৈলীর চিত্রাবলী থেকে সম্ভব হয়েছিল, তেমনি গ্রাম্য ও সহরে দুরোখা সংস্কৃতি আমার ভাগ্যে বিশেষ ফল দিয়েছিল বলেই আমার বিশ্বাস।

লিখতে লিখতে মনে পড়ল, বাল্যে কৃষ্ণনগরে থাকার কথা। কৃষ্ণনগর বিখ্যাত সরপুরিয়া সরভাজা এবং মাটীর তৈরী মূর্তিগড়ার জন্য। সেই খানেই প্রথম মাটীতে মূর্তিগড়ার হাতেখড়ি হল আমার। Jenningsএর নিকট বিলাতি ধরণে মাটীতে মূর্তিগড়া শেখার বহু পূর্বেকার কথা। তখনো art schoolএ ভর্তি হইনি। স্কুল পালিয়ে যেতাম বিখ্যাত ধুরন্ধর ভাস্কর যদুপালের বাড়ীতে। যদুপাল কলকাতার art schoolএ মাটীর কাজের শিক্ষক ছিলেন। তখন অবসর-প্রাপ্ত; তাঁর বেশ বয়স হয়েচে। চুর্ণি নদীর ধারে তাঁদের পাড়াটা যতদূর মনে পড়ে। যদুপালের ভ্রাতুষ্পুত্র বক্কেশ্বর পালও তখন কৃষ্ণনগরের একজন নামজাদা ভাস্কর। একবার তখন বাবার গুরুদেব পরমহংস স্বামী শিবনারায়ণ এসেচেন আমাদের বাড়ীতে, বক্কেশর পালকে ডাকলেন তাঁর মূর্তি গড়তে। তিনি স্বামীজিকে দেখে দেখে দুঘণ্টার মধ্যে সুচারুরূপে একটি চমৎকার প্রতিমূর্তি ছোট্ট সাইজে গড়ে দিলেন। বাবা তাঁকে আবার অর্ডার দিলেন তাঁর পিতা রাখালদাস হালদারের ফোটো থেকে ওই প্রকার একটি miniature প্রতিকৃতি গড়তে। তখনও পিতামহী জীবিত, আমাদের কাছেই কৃষ্ণনগরে আছেন। বক্কেশ্বরের গড়া পিতামহের প্রতিমূর্তি তাঁর বা বাবার মোটেই পছন্দ হলনা। পিতা তার দাম দিয়ে শিল্পীকে বিদায় দিলেন। আমার তখন কৌতুহল এবং উৎসাহ দুই উদয় হ'ল—বক্কেশ্বরের কাজ করার রীতি দেখে। একদিন চুপি চুপি গোলকামরার mantelpiece থেকে বক্কেশ্বরের গড়া সেই ঠাকুর্দার প্রতিমূর্তিটি নিলাম। তার শিরোভাগটি ভেঙে

আলাদা করে রেখে তার দেহের অংশটুকুর মাটী নিয়ে ঠাকুর্দার ফোটো দেখে পুনরায় একটি প্রতিমূর্তি খাড়া করলুম। সেটি বেশ জীবন্ত আকারে ফুটে উঠতেই ঠাকুরমা, বাবা, মা প্রভৃতি সকলেই আনন্দ প্রকাশ করলেন। আমি সেটি যদুপালের বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেখালুম। তিনি স্মিতহাস্যে "ব্রেবর্—ব্রেবর্" ব'লে আমার পিঠ্ চাপড়ে দিলেন। তাঁর এই করস্পর্শ আমার উপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ তুল্য আজও কাজ দিচ্ছে। সেই থেকে মাটীতে গড়ার কাজে যাতে হাত দিয়েচি আজ পর্যন্ত কখনো বিফল বা অসিদ্ধ হয়নি। বহুকাল মাটীর কাজ করা ছেড়ে দেবার পর, রবিদাদা মহাশয় যখন ভিয়েনা থেকে বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার Streliskytiokএর তোলা পোষ্টকার্ড সাইজের একটি তাঁর ফোটো লক্ষ্ণৌএ আমাকে পাঠান, আমি সেই ছবিটি থেকে একটি ছোট্ট relief plaque করলাম। তিনি দেশে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সেটি পাঠানোতে তিনি প্রীত হয়ে তার জবাবে কবিতায় লিখে পাঠালেন লক্ষ্ণৌএ :

আমার মূর্তি পূর্ণ করি
মুক্তি পেল তোমার শক্তি
রেখায় রেখায় নিত্য-শিখায়
দীপ্তি পেল তোমার ভক্তি
চক্ষে তোমার প্রাণের মন্ত্র,—
তাই তো তোমার ধ্যানের দৃষ্টি
তোমার রসে আমার রূপে
রচিল এই নূতন সৃষ্টি।

আশাবরী

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অনেক আশা ভালবাসায় দিলাম জলাঞ্জলি,
শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে তবু রূপসাগরের তীরে।
কেউ কোথা নাই, মনের কথা কাহারে আজ বলি
সন্ধ্যা হয়ে এল, আঁধার নামছে ধীরে ধীরে।

আঁধার এল গহন বনে আঁধার এল মনে
হায় রে আমার মনের মানুষ, হায় রে ভাগ্য-লেখা।
বিলিয়ে দিয়ে হৃদয় আমার শুধাই জনে জনে
এড়িয়ে চলে যে জন তাহার কোথায় পাব দেখা।

পথের ধূলায় পায়ের চিহ্ন—সে ধূলা নাই পথে
কাঁটাবনের আড়ালে পথ, পাইনা তাহার দিশা।
চেনা ফুলের গন্ধ যেন আসছে কোথা হ'তে
হায় রে কোথা পূর্ণিমারাত, সামনে অমানিশা।

হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি আজ ভীড় করে সম্মুখে
সন্ধ্যাকাশের তারায় তারায় চেনামুখের আদল
গান ভুলেছি—গানের সুরে কী যন্ত্রণা বুকে,
মহুয়া বনে ক্ষণে ক্ষণে বাজছে যেন মাদল।

আজকে একা একতারাতে বাজাই আশাবরী
নিরুদ্দেশের পথে ভাসাই আমার হৃদয়-তরী।

অভিযোগ

গোপাল ভৌমিক

তোমাকে আমি জানি না
কিংবা জেনেও মানি না
যে-টাই সত্য হোক
মিথ্যে করো না শোক।
অপরিচয়ের বেদনা ও গ্লানি
তুচ্ছ সে নয়, জানি আমি জানি
কিন্তু যখন না বুঝেই তুমি
মনে মনে গড়ো বধ্যভূমি,
ফাঁসির হুকুম দিয়ে দাও অনায়াসে—
ফোটে প্রতিবাদ আমার কণ্ঠাভাসে।

অভিযোগকারী বিচারক হয়ে এলে
বিচার পাবে না ধরে নিয়ে অবহেলে
ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ
করে জানি দোষী জন;
আমারও হয়েছে জেনো সেই দশা।
কামান দাগিয়ে তবু মারো মশা—
এর চেয়ে আছে দুঃখের কথা আর কি?
বার বার তুমি লাঠি ভাঙো তবু মরে না কিন্তু সাপটি।

আমার যা-কথা চাপা পড়ে থাকে
সত্য এবং মিথ্যার ফাঁকে;
অপরিচয়ের বেদনায় কাঁদি যদি
সে-কথা দেখনোর লোক নেই, নিরবধি

শুনি অপরের কান্নাই—
আমার চোখের জল বুঝি চুনি পান্নাই,
করেছে আমাকে ঋদ্ধ এবং সিদ্ধ
বেদনার বানে তাই নাকি আমি হই না কখনও বিদ্ধ।

অসম্ভব

সরযূপতি সিংহ

শ্রান্তির কালো ঘন অঞ্জন
মনের দু'চোখে মেখে,
জীবনের লগ্নদণ্ড যৌবনকে
পঙ্গু করে রেখে—
তবু বেঁচে থাকতে হবে
কেতন তুলে রাখতে হবে ?
—অসম্ভব, তা অসম্ভব !

আঘাত ব্যাহত করা
যৌবরাজ্য-অভিষিক্ত মন,
আত্মস্ফীত পৃথিবীকে
উদাসীন আত্মসমর্পণ—
বেঁচে থাকার মাদকতা
উর্ধ্বে তোলা উচ্চ মাথা ?
—অসম্ভব, তা অসম্ভব !

মেদুর মেঘের উতল আবেগ
আনবে প্রভঞ্জন,
মুক্তি খোঁজে লুটিয়ে পড়া
বিশীর্ণ বন্ধন
তেমন দিন আসবে কবে
জাগব যখন উচ্চ রবে ?
—অসম্ভব, কি অসম্ভব ?

বৃষ্টি

সরিৎ শর্মা

দূরের শহর থেকে ঝরো ঝরো বৃষ্টির এ-মুখর ধারায়
সাইকেলে সওয়ার হয়ে ছুটে এসো এ-শহরে স্নানের বিলাসে—
মেঘলা দুপুর গেলে কাজের টেবিলে কোনো ক্লান্ত জীবিকায় :

দেখতে দেখতে এলে : ভিড় জমা হয়ে আছে পথের দু-পাশে—
এ-বাড়ীর বারান্দায়, ও-বাড়ীর রোয়াকে বা গাছের তলায়,
দোকানে দোকানে ঢালু করোগেট কিম্বা কোনো ত্রিপলের নিচে—
উচ্ছল, ভীরু বা বন্দী, বৃষ্টির শাসনে ক্লিষ্ট, বিরহ-জ্বালায়
জ্বলে কেউ ! দেখে দেখে, জলের ফুলঝুরি এঁকে টায়ারে ও পিচে
তুমি এসো—চোখে-মুখে বৃষ্টি এঁকে লোনা-স্বাদ সজল হাওয়ায়···
(এ যেন বৃষ্টির মাঠ, বৃষ্টির শস্যের চারা গুচ্ছ গুচ্ছ হাসে)···
ঝরো ঝরো অবিরল বৃষ্টি ঝরে—মুছে মুছে আঁকা হয়ে যায়
বৃষ্টির ফোঁটায় আর খনিজ তেলের রঙে আলোর বিন্যাসে
রামধনু আলিম্পন !

আর শোনো বৃষ্টি ঝরে পাতায় পাতায়,
বাড়ীর কার্ণিসে ছাদে, টিন আর টালি আর খড়ের চালায়,
রাস্তায় মোটরে বাসে, দুরন্ত জলের স্রোতে, চলন্ত ছাতায়—
বৃষ্টির সিম্ফনী বাজে—বৃ ষ্টি বৃ ষ্টি—পৃথিবীর সংগীত-শালায় !

দূরের শহর থেকে একবার এসো এই স্নানের উল্লাসে—
তোমার বিমুগ্ধ চোখে চোখ রেখে সে-ও দেখ বৃষ্টি হয়ে হাসে !

পাঁশুটে আকাশ

সন্তোষ দাস

আকাশ যখন দিল
কমলা রঙের রোদ
একমুঠো সোনালী আবীর—

শীর্ণ শিরীষ ছায়া
শুকনো বাদামী ঘাসে
এলোমেলো করে এলো ভীড়—

তখন তো তুমি আমি
একরাশ ধুলো ঘেঁটে
স'য়ে এসে ফাইলের ঝড়

দিনের দাসত্ব শুধু
দেখি চেয়ে রেখে গেছে
দেহে মনে স্বেদাক্ত স্বাক্ষর।

পাশাপাশি বসে থাকি
চোখের সামনে জ্বলে
নক্ষত্রের নরম আকাশ—

লেকের ওপার থেকে
একরাশ ভিজে হাওয়া
নীচু হয়ে ছুঁয়ে যায় ঘাস,

তখনো তো দুটি প্রাণ
হতক্লান্ত মৌন মূক
তুমি আর আমি—

দিনের দৈত্যের কাছে
মুখ বুজে রেখে আসি
প্রেমের প্রণামী।

কমলা রঙের রোদ
সন্নত শিরীষ শাখা
ছায়া আঁকা ঘাস—

এখন স্মৃতিতে শুধু
চোখের সামনে ভাসে
ছাইরঙা, পাঁশুটে আকাশ।

আরেক পৃথিবী

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস

আরেক পৃথিবী ভোর হয়ে যায়ঃ আমাদের আনাগোনা।
দীপ্ত প্রাণের উন্মাদনায় সূর্য উদ্‌যাপনা;
তারি জৌলুস রাগে—
লাবণী লাস্য লাগে;
ফসিলের ভীড়ে কম্পনভীরু স্বপ্ন-সম্ভাবনা।
আরেক পৃথিবী ভোর হয়ে যায়ঃ আমাদের আনাগোনা।

ডালে ডালে ফুল, মাঠে মাঠে ফল-ফসলের উন্মেষে
জীবন-মোহানা প্রাণ-বন্যায় উচ্ছ্বাসে পড়ে ভেসে।
রাঙা জল জলা ভোরে
জীর্ণরা যাক্ ঝরে।
সুন্দর হোক্ জীবনের গানে যৌবন-বন্দনা।
আরেক পৃথিবী ভোর হয়ে যায়ঃ আমাদের আনাগোনা।

বেহালা

কৃতান্তনাথ বাগচী

নিশীথের নীল ডানা পৃথিবীর চোখের উপর
শিশির ঘুমের ঘোর, নেই কোন মানুষের স্বর;
আকাশে অনেক তারা
রাতের রহস্য মাঝে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে কারা!
কোন দূর বালুচরে ঝাউ ঝোপে শিরি শিরি হাওয়া
শুধু কোন বনবীথি কস্তুরীর নাভিগন্ধ পাওয়া
মহুয়া শাখার ডাক
এক ঝাঁক
মাতাল জোনাকী
পথভোলা ঘরছাড়া যাযাবর পাখী
আর সেই তুমি
প্রথম প্রেমের স্বপ্ন, দিগন্তের চিরশ্যামভূমি।
কত নামে, কত রূপে
চুপে চুপে
চেয়েছি তোমারে
বারে বারে।
কাছে এসে দাও নাই ধরা
ছাই হয়ে গেছে ধূপ কামনার শিখাডোরে মরা;
শুধু গন্ধ তার
ভরেছে বিরহ অন্ধকার।
নিশীথের নীল ডানা পৃথিবীর চোখের উপরে
ছায়ার পাখীর মত তোমার স্মৃতিরা আসে উড়ে
বিনিদ্রার বুকে দোলে খসে পড়া তারাদের মালা
ঘুমের নিঝুম রাত···কাঁদে কার সুরেলা বেহালা!

সৌন্দর্যের দৃষ্টি

চার্লস্ বোদলেয়র

শরৎ-আকাশ তুমি অনুপম পাণ্ডুর ও গোলাপী,
আমার রক্তেতে আছে বিষাদের যে মহাসাগর
জোয়ার-ভাঁটায় সে যে ওষ্ঠ মোর করে বর্ণহীন,
ওষ্ঠ মোর লবণাক্ত তিক্ত-বন্যা-স্মৃতির পরশে।
তোমার পরশখানি বৃথা ভেসে যায় মোর বুকে,
যা তুমি খুঁজিছ প্রিয়া কলুষিত হয়ে গেছে কবে
নারীর দশন ও নখে, বৃথা তুমি খুঁজিতেছ হায়
মোর প্রাণ যারে কবে খেয়েছে কুক্কুরে।

এটা সেই ভগ্ন স্তূপ যেথা বাস করে শৃগালেরা,
আঁচড়ায়, বধ করে, ছিঁড়ে তারা খায় লালসায়,
অনাবৃত অপরূপ তোমার বুকের সাগরেতে
সন্তরিছে গন্ধ এক নামহীন অচেনা মধুর।

আত্মার অরাতি তুমি হে সৌন্দর্য হোক তব জয়,
উৎসবে উঠেছে জ্বলি শিখাসম যে নয়ন দুটি,
সেই অগ্নি-শিখা দিয়ে পুড়াইয়া দাও নিঃশেষে
এই ছিন্ন-ভিন্ন প্রাণ পশুরা যা গেছে ফেলে রেখে।

অনুবাদ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ জন্মের স্বপ্নভঙ্গ

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না অমিতা। সুনন্দ এসেছে। সুনন্দ ব্রহ্মচারী। চোরের মতো তার ঘরে ঢুকেছে। তখন সবাইই ঘুমুচ্ছে। রাত প্রায় সাড়ে এগারো। অমিতার ঘুম আসছিল না। জেগে শুয়েছিলো আকাশের দিকে তাকিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে। দোরটা ভেজানো ছিল। ভেবেছিলো ঘুমোবার আগে বন্ধ করবে।

দোর খুলে ঘরে ঢুকল সুনন্দ। আজীবন ব্রহ্মচারী সে।

অমিতা চমকে উঠে বসল,—তুমি?

সুনন্দ একটু একটু হাসছিলো। জানালা দিয়ে পড়েছিলো ম্লান চাঁদের আলো।

দেখল সুনন্দ হাসছে যেমন চিরটা কাল হাসে, কিন্তু চোখটা ওর জলে ভরা যেন।

পদ্মকর্ণিকার মতো টানা টানা চোখদুটো সুনন্দর টলমল করছে। বললে তেমনি হেসে,—হেরে গেলুম। তাই বলতে এসেছি।—

বলে আবার একটু থেমে,—কাল ভোরেই চলে যাচ্ছি আশ্রম ছেড়ে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে? তুমি যা বলবে তাই হবে।

অমিতা মনে মনে নিতান্ত বিস্মিত হলেও, মুখে প্রকাশ করা ওর স্বভাব নয়। বলে,—কেন গো? এমন হোল কেন হঠাৎ?

সুনন্দর মুখের হাসিটুকুও মিলিয়ে গেল যেন, বললে,—হঠাৎ নয়। দেখলাম, মনের প্রতিটি তরংগে তোমার প্রেমের রূপ। একে ত' অস্বীকার করা যায় না। তাই বলি, যা সত্যি, তাকে সত্যি বলেই মেনে নিতে দাও।

—কিন্তু তোমার সাধন?

—এ জন্মের মতো এই সাধনই মেনে নিলাম। হয়ত বা প্রয়োজন ছিল।

অমিতা তাকায় সুনন্দর দিকে। আজ সুনন্দ তার হাতের মুঠোয়। সুনন্দকে নিয়ে অনেক অনেক খেলা খেলতে পারে সে এখন। তার জয় হয়েছে।

তবু ঠিক করতে পারছে না অমিতা কি বলবে সুনন্দকে।

বলে,—কিন্তু মণিময়?

সুনন্দ এবার হাসে,—ও ত' একটি সেতু, ওই সেতু পেরিয়ে তুমি আমার কাছে এলে।

সুনন্দ বুদ্ধিমান। সব বুঝেছে। সব বুঝেও এমন বোকা। হেরে গেলো সুনন্দ!

অমিতা কি বলবে ওকে?

সুনন্দ বলে,—কই বলো, যাবে আমার সঙ্গে ?

অমিতা কি উত্তর দেবে আজ।

চুপ করে বসে থাকে অমিতা।

জানালার বাইরে তাকায়। ম্লান চাঁদের চারপাশে সাদা সাদা মেঘ ভাসছে। মনে হয় যেন মেঘ ছুঁয়ে গেলো চাঁদকে, কিন্তু সত্যি ত' তা নয়! চাঁদ যে অনেক ওপরে। অমিতা চাঁদকে ঢাকলেও ছুঁতে পারেনি তাকে।

ভুল করেছে সুনন্দ।

অমিতা ভালবেসেছিলো সুনন্দাকে, আজও ভালবাসে। প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত। এতটুকু ফাঁক নেই। কিন্তু সে ভালবাসায় দেহের টান ছিল অনেকটা।

কলকাতা থেকে মাইল সতেরো দূরে গ্রামটি। সুনন্দ এলো এখানে প্রথম। আসবার একটা কারণ ছিলো। ওর গুরুর আদি বাস ছিল এখানে। ভাবলো এখানেই সাধনের সুযোগ হবে বেশী।

ছাব্বিশ বছরের সুনন্দ। সুন্দর যে খুব তা নয়। কিন্তু কান্তিময়। চোখদুটো ভাসা ভাসা যেন কিছুই দেখে না বাইরে, শুধু চোখ বোলায় মাত্র।

অমিতাদের বাড়ী থেকেই সেদিন সিধের বন্দোবস্ত হোল।

সিধেটা নিয়ে এলো অমিতা ওর দাদার সঙ্গে।

অমিতা দেখলো। অপরূপ। আশ্চর্য পুরুষ দেখলো।

দাদা বললে,—থালাটা নামা।

অমিতার জ্ঞান ছিল না। তন্ময় হয়ে দেখছিলো সুনন্দকে। দাদার কথায় চমকে থালাটা নামালো। গলায় আঁচল জড়িয়ে নিয়ে প্রণাম কোরল।

হাতজোড় করে প্রতিনমস্কার করলো সুনন্দ ব্রহ্মচারী।

একটু হাসলো সুনন্দ। বললো,—এত সব দরকার ছিলো না।

কি মিষ্টি হাসি আর কি মধুময় স্বর। শুনেছিলো অমিতা সাধকদের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট আর হাসি মধুর হয়। এ যে সত্যিই তাই।

সুনন্দর হাসি কঠিন প্রাণেও তৃপ্তির প্রলেপ দেয়। এর পরেও বহুবার এটা উপলব্ধি করেছিলো অমিতা। গরীব দাদার সংসারে অনটন ত' লেগেই থাকতো।

যখনই বৌদির সঙ্গে মনোমালিন্য হোত বা দাদা অন্যায় ভাবে বৌদির হোয়ে ওকে বকতো। ও চলে আসত সুনন্দর কাছে, ওদের বাড়ীর পাশেই সুনন্দর আশ্রম। সুনন্দ তাকাতো ওর দিকে, ওই রকম মধুর হেসে বোলত,—বোস, এমন অসময়ে কেন ?

অমিতার মনটা শান্ত হয়ে আসত সঙ্গে সঙ্গে।

—আজ কি রাঁধবে ?

সুনন্দর মুখে হাসি যেন লেগেই আছে—বলত,—কাঁচকলা।

অমিতা হাসত,—সাধু মানুষ আবার ঠাট্টাও জানে।

সুনন্দ মধুর স্বরে বোলত,—ঠাট্টা ত' করিনি। সত্যিই কাঁচকলা ভাতে ভাত।

অমিতা ফস করে বোলত,—দাও আমি রেঁধে দিই।

সুনন্দর মুখটা একটু রাঙা হয়ে উঠতো, বলতো,—স্বপাক ছাড়া খাইনে!

অমিতার মুখটা শুকিয়ে যেতো,—ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে পারি আর তোমার রান্না রাঁধতেই দোষ, কেন আমার কি অনেক পাপ ?

সুনন্দ হাসে,—না, না, তুমি বড় পুণ্যবতী। তবে আমার ওমনি একটা ব্রতের মতো আর কি!

অমিতার মুখটা ভার হয়ে উঠতো, উঠে পড়তো,—আচ্ছা চলি।

সুনন্দ ঘাড় নাড়তো।

অমিতার মুখ কেন ভার হোল, কেন অমিতা চলে গেল, এ নিয়ে কোন কৌতূহলই সুনন্দর নেই। ও নিজের মনের ভেতরে ডুবে দিবারাত্র কি দেখে যে বিভোর হয়ে থাকে কে জানে।

আশ্রমটি বড় সুনন্দর। চারদিকে কলাগাছ লাগিয়েছে সুনন্দ। ভেতরে কিছু দোপাটি, গাঁদা, বেল ফুলের গাছ। একটি শেফালিকার ঝাড় ওর ঘরের পিছনে। ছোট খড়ের ঘরটিতে থাকে সুনন্দ। মাঝে মাঝে বাইরের দাওয়ায় এসে বসে ছোট আসনটি পেতে।

অমিতার দাদা সন্ধ্যায় আসে প্রায়ই। আরও দুচার জন গাঁয়ের লোক আসে। আর আসে ঘোষ পাড়ার মণিময়। শান্ত আবহাওয়ায় ওরা বড় আনন্দ পায়। সব চেয়ে আনন্দ দেয় সুনন্দর মধুভরা কথা আর হাসি। সমস্ত দিনের সংসারের গ্লানি যেন ধূপের মত উড়ে যায়। প্রাণভরা শান্তি নিয়ে ফেরে সবাই রাত্রে।

অমিতা কিন্তু আসে বিকেলে।

সুনন্দ তখন হয়ত বা চুপ করে বসে আছে ঘরে—নিজের নেশায় নিজে বিভোর হয়ে।

অমিতা এসে বলে,—ধ্যান ভাঙল ? ওঠো। কি চুপ করে থাকতে পারে লোকটা।

সুনন্দ বিরক্ত হলেও হাসে।

অমিতা ঝাঁটা নিয়ে ঘর বার সব পরিষ্কার করে। বারান্দাটা লেপে মুছে দেয়। সন্ধ্যায় সবাই এসে বসবে। মণিময়ও আসবে তানপুরো নিয়ে গান গাইতে।

অমিতার দাদা অমিতাকে বলে দিয়েছে—ব্রহ্মচারীর ঘরদোরটা পরিষ্কার করে দিস রোজ বিকেলে।

অমিতা আসে, ঠিক দাদার তাগিদে নয়। নিজের মনের তাগিদে।

বারান্দা পরিষ্কার করে বলে,—কিছু কাচতে হবে। দাও। গা ধুতে যাবো।

—না। —বলে সুনন্দ।

অমিতা ওর বিছানার চাদরটা টেনে নামায়,—উঃ! কি নোংরা!

চাদরটা কিন্তু পরিষ্কারই ছিলো। তবু নোংরা বলে অমিতা কাচতে নেয়।

সুনন্দ জানে আপত্তি করে লাভ নেই। চুপ করে থাকে।

অমিতা আবার তাকায় সুনন্দর দিকে,—সাধু মশায়ের কি রাগ হোল নাকি ?

—নাতো। —বলে সুনন্দ।

অমিতা হঠাৎ শুধোয়,—আচ্ছা, তোমার বাবা মা আছেন ?

সুনন্দ বলে,—হ্যাঁ।

—মায়ের জন্যে মন কেমন করে না ?

সুনন্দ হাসে,—তেমন আর করে কই ! তেমন মন কেমন করলে ত' তাঁর দেখা পেয়ে যেতাম।

অমিতা কথাটার মানে ঠিক বোঝে না। বলে,—আমার কিন্তু মায়ের জন্যে মনটা বড় খারাপ লাগে। কি করা যায় বলোত ?

সুনন্দ বলে,—এখনও ?

অমিতা সুনন্দর কথায় চমকে ওঠে। ব্রহ্মচারী কি হাত গুনতে জানে ? সত্যিই কিছুদিন হোল তার মন খারাপ হয় না।

মাথা নীচু করে বলে,—তুমি আসবার পর থেকে আর হয় না।

সুনন্দ হাসতে হাসতে বলে,—কেন বলোত ?

—কি জানি ?

সুনন্দ ব্রহ্মচারী আর কথা বলে না।

অমিতা চলে যায়।

সন্ধ্যায় মণিময় আসে। তানপুরো হাতে। বড় প্রাণখোলা ছেলেটি। মনের ভেতর কোন কথা চাপতে পারা ওর স্বভাব নয়।

ও সুনন্দকে বলেছে, সবই বলেছে,—পরিষ্কার করে,—ওই যে অমিতা মেয়েটি দেখছ। ওকে ভোলবার জন্যেই আমি গান গেয়ে থাকি।

সুনন্দ হাসে,—তাই নাকি ?

মণিময় বলে,—ও মেয়ে সোজা নয়। বাইরে কত সুন্দর কিন্তু ভেতরটা ওর ভারী নোংরা। আমায় ত' একটা চড়ই মেরে বসলো।

—বলো কি ?

—হ্যাঁ, দোষের ভেতর আমি বলেছিলুম ওকে আমার খুব ভাল লাগে। কিছু অন্যায় বলেছিলুম ?

—কিছু না। —বলে সুনন্দ।

—মনটা ভাল লাগে না সাধুভাই !

সুনন্দ ব্রহ্মচারী হাসে। মধুর হাসি। বলে,—এখনও ?

মণিময় তানপুরায় টংকার দেয়, বলে,—না, তুমি আসবার পর থেকে আর মন খারাপ হয় না।

সুনন্দ হাসে চুপ করে।

অনেকগুলো দিন কেটে যায়। অমিতা ক্রমশঃ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সুনন্দর কাছে। সুনন্দ কিন্তু একই রকম। হাসি আর ঠাণ্ডা শীতল ভাব। মধুময় কথা। ব্যস্! আর কিছু নয়।

অমিতা যে আরও চায়। আরও অনেক কিছু।

কেন পাবে না সে ?

অমিতা কি সুন্দরী নয় ? স্বভাব সুন্দরী তন্বী অমিতা। যৌবন মদভারে কিছুটা উদ্ধতা।

অমিতা ভালবেসেছে সুনন্দকে।

জানে সুনন্দ সাধু। ব্রহ্মচারী। তবু ভালবেসেছে। ভালবাসার পেছনে কি বিচার থাকে।

ভালবাসা অন্ধ। অমিতা অন্ধ হয়ে ভালবেসেছে।

আজ বিকেলে চুল বেঁধে, রাঙা ছোট একটি টিপ্ পরে চোখের কোণে একটু কাজল দেয় অমিতা। পাতলা সাড়ীখানা আলতো করে জড়িয়ে নেয় গায়ে।

ছোট এক খিলি পান খেয়ে ঠোঁট দুটি রাঙিয়ে নেয়। আয়নায় নিজেকে দেখে। সত্যিই রূপসী অমিতা।

আজ সুনন্দকে হারাবে অমিতা।

সুনন্দ নিজে বারান্দা পরিষ্কার করছিলো অমিতার আসতে দেরী দেখে।

অমিতা এসে সুনন্দকে আলতো একটু ঠেলে বলে,—সরো। খুব হয়েছে।

সুনন্দ চমকে সরে দাঁড়ায়। সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিতে অমিতাকে একবার দেখে নেয়। অমিতা তার গায়ে হাত দিতে পারে এতটা ভাবেনি সুনন্দ।

চুপ করে সরে দাঁড়ায় ও।

অমিতা ঘর দোর পরিষ্কার করে আর সুনন্দর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে।

অনেক কথা বলবে ভেবেও লোকটাকে কিছুই বলতে পারে না অমিতা। পশ্চিমে রাঙা হয়ে আসে। অমিতা একটা নিশ্বাস ফেলে ঘরে যায়।

সুনন্দ বসেছিল একখানা বই হাতে।

—কি পড়ছো ?

সুনন্দ একটু সাবধান হয়,—সংস্কৃত বই একখানা।

অমিতা বইটা কেড়ে নেয় ওর হাত থেকে।

সুনন্দ কিছু বলে না তবু। রাগে না। হাসেও না।

অমিতা বইটা ওপাশে রেখে বলে,—তুমি মানুষের মন বুঝতে পারো ?

সুনন্দ চোখ তোলে,—পারি।

—ছাই পারো। আচ্ছা—একটা ঢোঁক গিলে বলে অমিতা,—তোমার কখনও বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়নি ?

সুনন্দ ব্রহ্মচারী একটু সরে বসে,—ও সব কথা থাক না।

অমিতা ওর কাছে এগিয়ে বসে,—আচ্ছা ভালবাসা কি অপরাধ ?

—না। —বলে সুনন্দ।

অমিতার গলাটা হঠাৎ ভারি হয়ে আসে,—তবে কেন তুমি ভালবাসাকে এত অবহেলা করো ?

তুমি ছাই বোঝ। কিছু বোঝ না। অমিতার চোখদুটো ছলছল্ করে।

সুনন্দ ব্রহ্মচারী অনেক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,—বাড়ী যাও অমিতা। আর কখনও এখানে এসো না।

অপমানে লজ্জায় অমিতার কানদুটো জ্বালা করে। চোখদুটোর জল শুকিয়ে যায় রাগের জ্বালায়।

আস্তে আস্তে উঠে চলে আসে।

এরপর অমিতা আর আসে না। বিকেলে সুনন্দকেই সব কাজ করতে হয়। মাঝে মাঝে ঘর পরিষ্কার করতে করতে থমকে দাঁড়ায় সুনন্দ। নিজের মনেই একটু হেসে সব কাজই নিজে করে। দিনগুলো কাটে।

নির্জন দাওয়ায় সূর্য ডোববার আগে বসে বসে হঠাৎ সুনন্দ যেন শুনতে পায় মুখরা অমিতার কলরব। চমকে ওঠে যেন। অমিতা আসেনি। সুনন্দর মনের কলরব। সুনন্দ নিজের উপর নিজে বিরক্ত হয়। বিকেলে আর ঘর দোর পরিষ্কার করে না। ধ্যান ধারণার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় সুনন্দ ব্রহ্মচারী। একচিন্তায় কাটতে চায় দিনরাত। সেখানে অমিতার স্থান নেই।

তবুও নিস্তার নেই। মণিময় তানপুরো নিয়ে আসে সন্ধ্যায়। বলে,—একি ঘর দোর যে বড় নোংরা হয়ে উঠছে দিন দিন সাধুভাই!

সুনন্দ কিছু বলে না।

মণিময় বলে,—জান সাধুভাই, অমিতা মেয়েটির কথা বলেছিলাম। ও সেদিন বেড়াতে এসেছিলো আমাদের বাড়ী। একটু আড়ালে ডেকে বললে আমায়, এতদিন কেন আসো নি, ওদের বাড়ী আর যেতাম না কিনা?—

মণিময় বলতে থাকে,—মেয়েটা নেহাৎ মন্দ নয়। একটু যা ইয়ে—মানে রগ্‌চটা। নইলে সেদিন কত কথা বললে!

সুনন্দ নিজের মনটাকে আলগা করে নিয়ে শুনতে চায় কথাগুলো। কিন্তু পারে না। মন উন্মুখ হয়ে উঠে শোনবার জন্যে।

স্থির হয়ে বসে থাকে ও।

মণিময় তানপুরার তারে টংকার দেয়, বলতে থাকে,—মেয়েটা মন্দ নয় সাধুভাই। ভালই।

সুনন্দ জবাব দেয় না।

আর একদিন এসে বলে মণিময়,—আজ এক কাণ্ড সাধুভাই। অমিতা যে আমায় এত ভালবাসে জানতাম না।

সুনন্দ স্থির হবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করেও যেন পারে না। একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়।

মণিময় বলে,—অমিতা বললে, আমি কিন্তু একোরেই সুন্দর নই! আমার কি কোন দাম নেই? বলতে বলতে কেঁদে ফেললে। কেঁদে ফেললে কেন বলোত, সাধুভাই?

সুনন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে ঘরে চলে যায়।

নিজের মনের দিকে তাকায় সুনন্দ। কৌতুকময়ীর নিত্য নোতুন কৌতুক। আর কত লীলা করবে? এখনও কি আমাকে নিয়ে তোমার কৌতুকের শেষ হোল না?

কাকে প্রশ্ন করে সুনন্দ কে জানে?

সুনন্দ মনে মনে হাসে। তবু হাসে। ও এতে জীবনের এক নোতুন লীলার আনন্দ পায় যেন। অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন বসে থাকতে হয়।

পরের দিন সুনন্দ চলে যায় ঘর ছেড়ে। অনেক দূরে ঘুরে বেড়ায় সমস্ত দিন। তিন চারটে গ্রাম ঘুরে ঘুরে এক গাছের তলায় বসে পড়ে।

তবু শান্ত মনে ওর আনন্দ যায় না। জ্বালা নেই, বেদনা নেই, এক নোতুন জীবন মায়ার আস্বাদ।

ভালই। এও ভাল। এও সত্য।

সন্ধ্যায় সেদিন সবাই এসে ফিরে যায়।

সুনন্দ ব্রহ্মচারীর ঘর বন্ধ। হয়ত বা কোথায় গেছে সে সাধনের কাজে।

সন্ধ্যার অনেক পরে রাত্রে কিন্তু সুনন্দকে ফিরতে হয়।

ফিরতে হয় অমিতার ঘরে।

অমিতার প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়,—এ জন্মের মতো এই সাধনই মেনে নিলাম। হয়ত বা' প্রয়োজন ছিল।

অমিতা তাকায় সুনন্দর দিকে। উঠে আসে।

সুনন্দর হাত ধরে।

সুনন্দ বলে,—চলো আমার সঙ্গে।

অমিতার চোখদুটো আজ জলে ভেসে যায়।

সুনন্দর এত বড় পরাজয়ে বুক ভেঙে যায় ওর।

ও রুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—না। তুমি হারতে পাবে না।

সুনন্দ চুপ করে থাকে।

অমিতা কাঁদে, বলে,—তুমি হেরে গেলে আমি সইতে পারব না। কিছুতেই না। তুমি চলে যাও। আজই চলে যাও এখান থেকে।

সুনন্দ হাসে,—তুমি যাবে না।

—না।

সুনন্দ বলে,—তোমার কোন কষ্ট হবে না?

—না।

—তবে আমি যাই।

অমিতা চোখ মোছে। প্রথম দিনের মতো আঁচল গলায় দিয়ে প্রণাম করে সুনন্দকে।

সুনন্দ ঘর থেকে বেরোয়।

বেরোয় পথে।

অমিতা তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ সুনন্দকে দেখা যায়।

হয়তো সমস্ত জীবনেও আর সুনন্দ ব্রহ্মচারী আসবে না তার কাছে।

ও জানে আর আসবে না।

তবু বুক ভরা এক অনাস্বাদিত তৃপ্তি নিয়ে দোরে খিল দেয় অমিতা।

এবার ঘুমোবে ও।

আফ্রিকার কথা

অন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী—

প্রিয়বরেষু,

সেদিন কোন আসমান থেকে নেমে এলেন আপনি। এসেই বললেন আফ্রিকার কথা। যে আফ্রিকা আপনার চোখে দেখা। যে চোখ দিয়ে ধারা বয়েছে।

আমাকে বললেন, "আপনিও একবার দেখে আসুন আফ্রিকা।"

আমি বললুম, "আমি গেলে আমিও তো কাঁদতুম। ও ছাড়া আর কী করতে পারতুম!" তার পর খুলে বললুম আপনাকে আমাদের নিজেদের দেশের কথা। আমার কাজ এইখানে। ঘর ভেঙে গেছে, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া এখনো মিটল না। বাঙালীর দুর্গতির অবধি নেই। এ দুর্গতির পিছনে দুর্মতি। কবে এরা প্রকৃতিস্থ হবে, কেমন করে হবে, ভাবতে যদি হয় এসব ভাবি আগে। তার পর আফ্রিকার কথা।

কিন্তু আপনার চলে যাওয়ার পর থেকে দেখছি আফ্রিকাই আমাকে পেয়ে বসেছে। জানি, কিছু করবার নেই। তবু কোন পথে মঙ্গল তা বুঝতে চেষ্টা করছি।

বিংশ শতকের মধ্যভাগে কয়েকটি সুসভ্য জাতির লোক প্রকারান্তরে ক্রীতদাস প্রথা চালিয়ে যাচ্ছে, বহির্জগৎকে জানতে দিচ্ছে না। বহির্জগৎ যদি বা জানতে পাচ্ছে পরের এলাকায় হস্তক্ষেপ করতে পারছে না, করতে চাইছে না। উচিতও নয় হস্তক্ষেপ। আমাদের পঞ্চশীল নীতি পরের ঘরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ পরিহার করতে বলে। সুতরাং কোনো এক ইউরোপীয় শক্তি যদি তার সাম্রাজ্যের কোনো এক অঞ্চলে সক্ষম মানুষদের ধরে বেঁধে বহু দূরে চালান দেয় ও খনির কাজে বা খামারের কাজে লাগায়, যদি অনিচ্ছুকের হাত কেটে দেয় বা পায়ে বেড়ী পরায়, যদি শিকল দিয়ে বেঁধে দলকে দল লোককে নিবিড় অরণ্যে গাছ কাটতে পাঠায় ও তাদের কঙ্কালে পথ ছাওয়ায়, যদি পারিশ্রমিক না দিয়ে তার বদলে দেয় মদ তা হলে আমরা দু'পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক পক্ষকে নিবৃত্ত ও অপর পক্ষকে সুরক্ষিত করতে পারিনে। সেদিক থেকে আমরা অক্ষম।

কিন্তু আমরা ধিক্কার দিতে পারি, প্রতিবাদ করতে পারি। বিশ্বের জনমত সব শক্তির উপরে। বিশ্বের বিবেক সব সরকারের উর্ধ্বে। বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ এক কথা, উপর থেকে নৈতিক চাপ অন্য কথা। দুটো যদি গুলিয়ে না যায় তা হলে নিঃস্বার্থ নিষ্কাম বিবেকী ব্যক্তিদের ধিক্কার ও প্রতিবাদ অনেক দূর যেতে পারে। আগের মতো প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে অত্যাচার যে চলছে না, এটা এইসব ধিক্কার ও প্রতিবাদের ফলেই।

তার পর আজকাল ইউনাইটেড নেশনস হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিস রয়েছে। আফ্রিকার শাসকরা এসব সংস্থায় যোগ দিয়েছেন। এই সূত্রে আন্তর্জাতিক জনমত তাঁদের কানে সব সময় পৌঁছচ্ছে। তাঁদেরকেও পদে পদে জবাবদিহি করতে হচ্ছে। আইনত তাঁরা বাধ্য নন। কিন্তু ন্যায়ত বাধ্য। ইন্টারন্যাশনাল এখনো শিশু অবস্থা। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ইউসেজ বা লোকাচার শৈশব অতিক্রম করেছে। তা না হলে আমাদের এই সনাতন ধর্মের দেশে বহুবিবাহ রাতারাতি রদ হতো না। আর পাকিস্তানের শরিয়তী বেহেস্তে হুরী পরীদের মধ্যেও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যেত না।

আন্তর্জাতিক সদাচার আফ্রিকার অত্যাচারীদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। শুনতে পাই সেখানে মানুষকে বিনা দোষে বা নামমাত্র অপরাধে জেলে পাঠানো হয়, জেল থেকে বড় বড় জোতদার সাহেবদের জমিতে বেগার খাটতে চালান দেওয়া হয়। কয়েদীর শ্রমের মূল্য নেই। এক একজন জোতদার হয়তো এক এক লাখ একর জমি দখল করে বসে আছে, নিজে চষতে পারে না, পয়সা খরচ করে মুনিষ খাটাতে রাজী নয়। আর মুনিষও এমন যে পয়সার জন্যে খাটবে না, পয়সার দাম বোঝে না। পয়সার জন্যে ঘরবাড়ী ছেড়ে দূর দেশে গিয়ে মেহনৎ করতে চায় না। তারা যদি যে যার ঘরে পড়ে থাকে তা হলে আফ্রিকার খনি খামার কলকারখানা অচল হয়, দেশের বিকাশ হয় না, শ্বেতাঙ্গদের তো লোকসান হয়ই, কৃষ্ণাঙ্গদেরও জীবনযাত্রার পরিবর্তন হয় না। আফ্রিকার রূপান্তরের ঐতিহাসিক প্রয়োজন আফ্রিকার অত্যাচারিতদেরকেও শান্তিতে থাকতে দেবে না।

সকলের কাছে শুনি আফ্রিকার রূপান্তর জোর কদমে চলেছে। এমন কি ভারতের চেয়েও জোরসে। জোরসে চলার ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেনে নিলে জোর জুলুমকেও সম্পূর্ণ এড়ানো যায় না। শিল্পবিপ্লবের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডেও জোর জুলুম হয়েছিল, রাশিয়াতে এখনো হচ্ছে। চীনেও। সেসব দেশে বর্ণভেদ নেই। অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়েরই গাত্রবর্ণ এক। আফ্রিকায় যদি বর্ণভেদ না থাকত তা হলেও জোর জুলুম থাকত। সেটা অল্প সময়ের মধ্যে অধিক শ্রীবৃদ্ধির একটি শর্ত। আফ্রিকার রূপান্তর গত দেড়শো বছরের মধ্যে যতটা হয়েছে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তার বহুগুণ হবে। নতুবা আফ্রিকা অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। পশ্চাৎপদ থেকে যাবে। এই ত্বরান্বিত বিকাশ যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন—ক্যাপিটালিস্ট বা কমিউনিস্ট—জোর জুলুম একেবারে বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে আন্তর্জাতিক সদাচার যদি সর্বদা সক্রিয় থাকে তা হলে অত্যাচারীও উপরওয়ালার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে। সে উপরওয়ালা হচ্ছে বিশ্বজনমত। ইউনাইটেড নেশনস। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিস। খ্রীস্টীয় চার্চ।

খ্রীস্টধর্মের হয়েছে জীবনসঙ্কট। তার প্রতিষ্ঠাতা নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তোমরা সব দেশে যাও, সব মানুষের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দাও। সুসমাচার কী? সব মানুষ ভাই ভাই। সকলেই এক পিতার সন্তান। কিন্তু আফ্রিকায় যাঁরা এই বাণী পৌঁছে দিতে গেছেন তাঁদের অনেকেই অন্তরে অন্তরে স্বীকার করতে রাজী নন যে শাদা ও কালো ভাই ভাই। তাঁদের বেশ কিছু লোক আফ্রিকার

কালো মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করেন না, ওরা যদি মনুষ্য হয়ে থাকে তো বনমানুষ। খ্রীস্টধর্ম তা হলে ওদের জন্যে নয়। অথচ খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতেই এঁরা সেখানে গেছেন, শোষণ বা শাসন করতে নয়। ঘটনার গতি যে দিকে চলেছে তা দেখে মনে হয় খ্রীস্টধর্ম আফ্রিকায় আর প্রসার লাভ করবে না। গত শতাব্দীতে যেমন ভারতে ধীরে ধীরে থেমে গেল এই শতাব্দীতে তেমনি আফ্রিকায় ক্রমে ক্রমে থেমে যাবে। কেনিয়াতে কিকিয়ুদের সংখ্যা দশ লাখের মতো। তিন বছরের বিদ্রোহের ফলে আট হাজার জনের উপর নিহত হয়েছে, তার অর্ধেক আহত অবস্থায় ধরা পড়েছে। সাতশো জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সত্তর হাজার বন্দিশালায় আছে। এ হলো গত মে মাসের হিসাব। লোকসংখ্যা যেখানে দশ লাখের মতো সেখানে এত বড় ত্যাগ আধুনিক ইতিহাসে কে কোথায় দেখেছে? আমাদের লোকসংখ্যা চল্লিশ কোটি। আমরাও কি তিন বছরে এই পরিমাণ ত্যাগ করেছি? তা সত্ত্বেও কিকিয়ুদের মনোবল ভেঙে যায়নি। তারা আত্মসমর্পণ করেনি। মশা মারতে কামান দাগার মতো এরোপ্লেন থেকে বোমা বর্ষণ করেও তাদের দমন করতে পারা যায়নি। ইংরেজের পক্ষে এটা নৈতিক পরাজয়। খ্রীস্টধর্মের পক্ষেও। কারণ কিকিয়ুরা মনের জোর পাচ্ছে তাদের প্রাচীন ধর্ম থেকে, নতুন ধর্ম থেকে নয়। যে ধর্ম অত্যাচারিতের পক্ষে না দাঁড়িয়ে অত্যাচারীর পক্ষে দাঁড়ায় তার কাছে বিদ্রোহীরা কিসের প্রেরণা পাবে? মাথা হেঁট করার, না মাথা উঁচু করার?

কিকিয়ুদের হয়তো পোকামাকড়ের মতো মেরে শেষ করে দেওয়া যাবে, কিন্তু প্রাচীন ধর্ম থেকে ত্যাগের প্রেরণা পেয়ে বছরের পর বছর বিদ্রোহ চালিয়ে যাওয়া সেইখানে শেষ হয়ে যাবে না। মাঝখানে মন্দা পড়বে। তার পর আবার বাধবে। এক আধ শতাব্দী একটা মহাদেশের জীবনে এমন কিছু দীর্ঘ সময় নয়। এশিয়ার মতো আফ্রিকাও একদিন মুক্ত হবে। কিন্তু তত দিনে খ্রীস্টধর্মের মর্যাদা কাদায় নেমে থাকবে আর ইউরোপীয় জাতিগুলির মর্যাদা ধুলোয় মিশে থাকবে। এটা বুঝতে পেরে এখন থেকে উদার নীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়। কিন্তু তার উদ্যোগ যা দেখছি তা ছেলে ভোলানোর মতো। তাতে মডারেট আফ্রিকানরা ভুলতে পারে, কিন্তু লড়নেওয়ালা আফ্রিকানরা ভুলবে না। এ লড়াই অনেক দূর গড়াবে।

এটা অহিংস লড়াই নয়। যারা লড়ছে তারা সভ্যজাতির লোকও নয়। তারা যদি অশ্লীল দীক্ষা নেয়, নর রক্ত পান করে, বীভৎস প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয় আমরা তার সমর্থন করব না। কিন্তু তাদের নিন্দা করার আগে এটাও ভেবে দেখব যে তাদের শত্রুরাও তো তাদের মানুষ বলে গণ্য করছে না। দেখবামাত্র গুলী করছে। স্ত্রী যাচ্ছে স্বামীকে খাবার দিতে। তাকেও গুলী করতে বাধছে না। ঐটুকু দেশে ওদের হাতে কীই বা অস্ত্র আছে বা থাকতে পারে! কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিকতম মারণাস্ত্র। যারা ব্যবহার করছে তারা সভ্যতার জাঁক করে। তাদের এরোপ্লেন আছে। বোমা আছে। এটা ভালো করে সমঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা কখনো এর সমর্থন করব না। কিকিয়ুদের এমন কোনো সুনাম নেই যে নষ্ট হবে। হলেও তারা প্রাণের দায়ে লড়ছে। কিন্তু ইংরেজের সুনাম নষ্ট হলে ইংরেজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাকেও নেমে

যেতে হবে আফ্রিকাবাসীর সমতলে। বর্বরতার রসাতলে। এতে যদি ইংলণ্ডের জনমত বিক্ষুব্ধ না হয় তবে বুঝতে হবে সভ্যতার নেতৃত্ব তাদের হাত থেকে চলে গেছে।

তবে আফ্রিকানদেরও মনে রাখতে হবে যে প্রাচীন যুগে ফিরে যাওয়ার পথ চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রাইবাল সমাজব্যবস্থা তো হাজার হাজার বছর ধরে পরীক্ষা করা গেল। একই পরীক্ষা আর কত কাল চলবে! ইতিহাস নতুন কোনো পরীক্ষা চায়। প্রকৃতিরও নিয়ম তাই। আফ্রিকানরা যা জানে তার মায়া কাটিয়ে যা জানে না তার শিক্ষা নিক। নিতে হলে ইউরোপের কাছেই নিতে হবে। সুতরাং ইউরোপের সঙ্গে বিচ্ছেদ কখনো কাম্য হতে পারে না। আর খ্রীস্টধর্মের বর্তমান প্রচারকরা দীনাত্মা ও তাঁদের স্বজাতীয়রা দুরাত্মা হলেও তার প্রবর্তকের আত্মা মহান। সব মানুষকেই তিনি ভালোবেসেছেন। তাঁর মূল নীতি সব মানুষের জন্যে। খ্রীস্টীয় মূলনীতি বৌদ্ধ মূলনীতি মানবজাতির সম্পদ। যারা নাস্তিক তাদের জীবনেও খ্রীস্টীয় বৌদ্ধ গান্ধীয় মূলনীতির স্থান আছে। আফ্রিকানরা একে অগ্রাহ্য করতে পারে না। দীক্ষা নিয়ে খ্রীস্টান হয়তো হবে না। নাই বা হলো। কিন্তু খ্রীস্টীয় মূলনীতির চেয়ে বড় কিছুর সন্ধান না পেলে তারই প্রয়োগ করতে হবে। ট্রাইবাল নীতি যদি তার চেয়ে বড় হয়ে থাকে তবে অন্য কথা। কিন্তু ছোট হয়ে থাকলে তার ঊর্ধ্বে ওঠা উচিত।

তেমনি গত কয়েক শতাব্দীতে ইউরোপে যেসব আন্দোলন হয়েছে—রেনেসাঁস, রেফর্মেশন, ফরাসী বিপ্লব, লিবারল মতবাদ, ডেমক্রেসী, সোশিয়ালিজম, রুশ বিপ্লব—এসব আন্দোলনের পরিধি ইউরোপেই নিবদ্ধ নয়। আফ্রিকাও এর থেকে শিখতে বাধ্য। নতুন যুগের আফ্রিকানদের মন এর দ্বারা তৈরী হবে। কিন্তু ঐতিহ্যকে বর্জন করে নয়।

ঐতিহ্যের কথা উঠলেই সব দেশের মানুষ রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। ভালোমন্দ সুন্দর কুৎসিত সব কিছুকে আঁকড়ে ধরে। আফ্রিকানদের ঝোঁকটাও আমাদের সনাতনীদের মতো। এদেশে যেমন সতীদাহ ওদেশে তেমনি কয়েক রকম কদর্য ও নিষ্ঠুর প্রথা আছে, ঐতিহ্যের নামে সেগুলোর প্রতি আনুগত্য রয়েছে। শিক্ষিত আফ্রিকানদের কাজ হবে এসব ঝাঁট দিয়ে ঘর সাফ করা। নইলে আধুনিক যুগের সঙ্গে তাদের বনবে না। একে তো ইউরোপের সঙ্গে ঝগড়া, তার উপর আধুনিক যুগের সঙ্গে অবনিবনা। দুই ফ্রণ্টে লড়তে গিয়ে তারা হারতে থাকবে। অন্তত একটা ফ্রণ্টে মিটমাট চাই। সেটা আধুনিকতার ফ্রণ্ট। এ কথা এশিয়া সম্বন্ধেও খাটে। ভারতেরও দ্বিধা কাটেনি। পাকিস্তানের তো নয়ই।

আফ্রিকাকে আধুনিক হতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইউরোপ তার শত্রু নয়। বরং সহায়। অথচ অপরাপর ক্ষেত্রে ইউরোপ তার মহাশত্রু। ইউরোপীয়রা কালো রং সইতে পারে না। যেখানে সেটুকু সহিষ্ণুতা আছে সেখানে ধর্মগত অসহিষ্ণুতা। যেখানে চর্ম ও ধর্ম দুই সহ্য হয় সেখানে ছোটলোকের আস্পর্ধা অসহনীয়। আফ্রিকানমাত্রেই ছোটলোক, এই যেমন বাগদী বাউরি চাঁড়াল আর কি! আফ্রিকানমাত্রেই দাসবংশের লোক। দাস বা দস্যু। অবিকল বৈদিক মনোভাব। এর থেকেই এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকার আপারথাইড বা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। এর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি

দিয়ে বুঝতে হবে। সে যুদ্ধে এক কোটি আফ্রিকান যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তা হলেও সে যুদ্ধে সন্ধি নেই। সেই কুরুক্ষেত্রের জন্যে আফ্রিকার মাটি তৈরি হচ্ছে। হবে একদিন রক্তপাত। আফ্রিকায় যেসব শাদা মানুষ থাকবে তারা সন্ধি করে থাকবে, গায়ের জোরে নয়। সন্ধির শর্ত হবে কালো মানুষকে স্বাধীন ও সমান বলে স্বীকার করা। তারা যদি খুশি হয়ে ভোট দেয় কোনো শাদা মানুষকে তা হলেই তিনি তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারবেন, নয়তো কর্তৃত্বের আশা ছেড়ে দিয়ে এখানকার মতো ব্যবসা বাণিজ্য করবেন। কিন্তু আফ্রিকার মাটিতে সংখ্যাগুরু আফ্রিকানদের দাসত্বের ভিত্তিতে বর্ণাশ্রমী রাজ্য স্থাপন বিনা রক্তপাতে সম্ভব নয়। যুগটা এমন যে মরীয়া হয়ে উঠলে কালো লাল হয়ে যায়। চোখের উপর হলদেও লাল হয়ে গেল। চীনারা যা পারে, কোরিয়ানরা যা পারে, ভিয়েটমিনের লোক যা পারে আফ্রিকার বুনোরাও তা পারে। মানুষকে অতটা অপদার্থ মনে করাই ভুল। এর পরের অধ্যায়ে হয়তো কিকিয়ুরা কমিউনিস্ট হয়ে যাবে। যেমন একদিন শূদ্ররা মুসলমান হয়ে গেল।

আফ্রিকা উঠবেই। সুপ্ত সিংহের মতোই উঠবে। ভবিষ্যৎ তো তারই। বর্তমানটা না হয় ইউরোপ আমেরিকার। আমরা তা হলে আফ্রিকার জন্যে কাঁদব না। সতর্ক থাকব যাতে আফ্রিকায় আমাদের লোক কোনোরকম ভুল না করে। ইতি। আপনার

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ অন্নদাশঙ্কর রায়

শরৎসাহিত্যের ভূমিকা

রথীন্দ্রনাথ রায়

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর প্রায় সতেরো আঠারো বছর কেটে গেল। এর মধ্যেই শরৎ-সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ের নানামুখী প্রচেষ্টা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কার্যত দেখা গেলো, যে পরিমাণ আমরা মুখে শরৎচন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছি, ঠিক সেই অনুপাতে শরৎসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ বিচার করি নি। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থটির পরে শরৎচন্দ্রের তেমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয় নি। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি লেখা ছাড়া সাম্প্রতিক কালেও শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে তেমন মৌলিক আলোচনা চোখে পড়েনি। অবশ্য নিতান্ত বিশেষত্ববর্জিত ও মামুলি ধরণের লেখা সব সময়েই কিছু কিছু চোখে পড়ে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যেন এখনও আমরা নূতন করে ভাবতে অভ্যস্ত হই নি—গোটাকতক বিশেষণের চারপাশ দিয়েই আমরা শুধু আবর্তিত হচ্ছি।

শরৎচন্দ্র-সম্পর্কিত আলোচনায় এযাবৎকাল যেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে তা প্রধানত "সমাজ-সংস্কারক" শরৎচন্দ্রের ভূমিকা। কারণ এক সময় এই নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। আরো তিনটি বিশেষণ শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে খুবই প্রচলিত—সে তিনটি হলো "দরদী," "মরমী" ও "পতিতা" সাহিত্য স্রষ্টা। প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষণ তিনটির পেছনে কোন বিশ্লেষণী চিন্তাধারা কাজ করে নি, যতটা করেছে পঞ্চমুখ আবেগ-প্রবণতা। শরৎচন্দ্রের সাম্প্রতিক সমলোচকেরা যদি প্রচলিত সমালোচনার বেড়াজাল অতিক্রম করতে না পারেন, তবে সার্থক শরৎসাহিত্য সমালোচনা গড়ে উঠতে আজো অনেক দেরী আছে বলতে হবে।

শরৎসাহিত্য-সমালোচকের প্রথম কর্তব্য হবে প্রচলিত সমালোচনার সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ। শরৎচন্দ্র সত্যই বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ থেকে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন কিনা? যদি নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে কোন্ অর্থে এবং কি ভাবে? সমাজ-সমস্যার বহু আলোচনা শরৎ-সাহিত্যে আছে। কিন্তু তার যথার্থ প্রকৃতি কি, বিচার করার অবকাশ আজ এসেছে। সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব—শরৎচন্দ্রের চরিত্র সমূহের একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব। সম্ভবত মানব-সভ্যতার মধ্যে এতো বড় দ্বন্দ্ব আর নেই। শরৎচন্দ্র এই সংঘাত ও বিরোধের পূর্ণতর চিত্র এঁকেছেন—অথচ, মানবিক সহানুভূতি কোথায়ও ক্ষুণ্ণ হয় নি। কিন্তু তার সঙ্গে আর একটি প্রশ্নও জাগে, চিরাচরিত সংস্কারকে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র অতিক্রম করতে পেরেছেন কিনা। কমল ও অভয়া ছাড়া আর কোন নারী-চরিত্রই বোধ হয় প্রচলিত সংস্কারকে অস্বীকার করতে পারে নি। কমল সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজ ও পরিবেশের মানুষ - এই জন্য প্রচলিত সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্ব তার জীবনে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব ছিল না। অভয়া বিদ্রোহিণী সন্দেহ নেই—অথচ সেই বিদ্রোহে নারী-মনের স্বাভাবিক মমতা ও

হৃদয়-মাধুর্য কোথায়ও ক্ষুণ্ণ হয় নি। একদিকে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, সচ্ছ অন্যদিকে নারীর যুক্তি, সহজাত নমনীয়তা—এই দুয়ের সমন্বয় শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রটিকে অনন্য সাধারণ মর্যাদা দিয়েছে। অচলা ও কিরণময়ী—শরৎসাহিত্যের এই বহু-আলোচিত চরিত্র দুটি তথাকথিত বৈধতার সীমা বহুলাংশে লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু আবার তাদের প্রচলিত সামাজিক জীবনের সীমায় ফিরে আসতে হয়েছে। ডিহিরী-যাত্রার আগে ও পরে শরৎচন্দ্র যে প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি এঁকেছেন শিল্পাংশে তার তুলনা নেই। মেঘ-বৃষ্টি ভরা দুর্দিন, প্রায়ান্ধকার গ্রাম্য ষ্টেশনের ছায়া-ধূসর পরিবেশ, বর্ষণক্লান্ত ছায়া-পাণ্ডুর সকালবেলা—সমস্ত কিছু যেন এক গভীর-সঞ্চারী ইঙ্গিতে শঙ্কাতুর। এ দৃশ্য যেন আত্মদ্বন্দ্বজর্জরিতা অচলারই মনোজীবনের প্রতিচ্ছবি। ডিহিরীর সেই দুর্যোগের রাত্রি যেখানে অচলা সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, তার পরবর্তী চিত্র সঙ্কেতমূলক—অচলার শীর্ণগণ্ড ও পাণ্ডুর মুখশ্রীর মধ্যে ফুটে উঠেছে।

কিরণময়ী দিবাকরের কাছে দেহ-নির্ভর নারীসৌন্দর্য ও দেহনিষ্ঠ প্রেমের ব্যাখ্যা করেছে। বাক্-বৈদগ্ধ্যে, বুদ্ধিদীপ্তিতে ও মননশীলতায় কিরণময়ী অনন্যা। কিন্তু তার মর্মান্তিক পরিণতির চিত্রটির সঙ্গে পূর্বতন জীবনাচরণের পাশাপাশি তুলনা করলেই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। কিরণময়ীর মনোবিকারের সঙ্গে তার অপরাধ-চেতনা ও অন্তস্তলশায়ী সংস্কারবোধ যে অনেকখানিই জড়িত ছিল তা বেশ বোঝা যায়। সতীশ-সাবিত্রীও তাদের একদা-আচরিত জীবন থেকে এক আদর্শ-রঞ্জিত জ্যোতির্লোকের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। সংস্কার-স্বীকৃতির প্রচলিত পথে জীবনের ক্ষণ-বিদ্রোহ দূর-বিস্মৃত কালের স্মৃতিরেখার মতোই জেগে থাকে।

তথাপি এ কথাও অনস্বীকার্য যে শরৎচন্দ্র আগামী কালের দিশারী। তাঁর নায়িকা-চরিত্রের মধ্যে সংস্কারপ্রবণতা যতই থাক না কেন, তবুও অচলায়তন সমাজ-ব্যবস্থার সামনে তাঁরা এক নূতন প্রশ্ন এনেছেন। আমাদের সমাজব্যবস্থাকে শরৎচন্দ্র আঘাত করেছেন, তার ভিত্তিমূল ধরে তিনি নাড়া দিয়েছেন। "শ্রীকান্ত" প্রথম পর্বে বর্ণিত নিরুদিদির পদস্খলনের কাহিনীকে অবলম্বন করে শরৎচন্দ্র হিন্দুসমাজ প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তা চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে :…"কিন্তু সেই নিরুদিদি ত্রিশ বছর বয়সে যখন পা-পিছলাইয়া গেল, এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন উঁচু মাথাটি একেবারে মাটির সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকেই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল না। দোষস্পর্শ-লেশহীন নির্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।"—"অরক্ষণীয়া" "বামুনের মেয়ে" ও "পল্লীসমাজ"—এই কাহিনী-ত্রয়ীতে শরৎচন্দ্রের সমাজ-সমালোচনা চূড়ান্ত স্তরে আরোহণ করেছে। সমাজ রক্ষার মুখোস পরে অত্যাচার যে কতদূর নির্মম হতে পারে শরৎচন্দ্র তা আমাদের দেখিয়েছেন। সচরাচর নির্মম শ্লেষাত্মক কশাঘাত এবং সহানুভূতি-প্রবণতা—এই দুই বৃত্তিকে পরস্পরবিরোধী হিসেবেই আমরা দেখতে অভ্যস্ত। শরৎচন্দ্র এখানে অপূর্ব সমাধান করেছেন—কঠোর ও সুস্পষ্ট-লক্ষ্য সামাজিক বিদ্রূপের সঙ্গে সমবেদনার অশ্রুজলরেখা মিশিয়ে দিয়েছেন। এইদিক দিয়ে শরৎচন্দ্র যেমন অভ্রান্ত সমাজ-সমালোচক, তেমনি নবযুগের নবীন জীবন-

বাদের উদ্গাতা। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত ঐতিহ্যের বাণীবাহক হয়েও তিনি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যিকদের পুরোধা। মধ্যবিত্ত ও গ্রামজীবনের রূপকার হিসেবে তিনি এক নূতন দলিল আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের "গোরা"-"চোখের বালী" ও গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে আমরা সমস্যামূলক কথাসাহিত্যের নূতন পথনির্দেশ পাই। সামাজিক ও পারিবারিক ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর অনেকগুলি ছোটগল্পের প্রাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সাধারণ ছবিই আঁকা হয়েছে—কবির মুক্তপক্ষ কল্প-বিহার এক দুর্নিরীক্ষ্য জগতের স্বতন্ত্র রহস্য-সন্ধানের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র সমাজ-জীবন-চিত্রণে অতি-নিবদ্ধ। শরৎচন্দ্রের সমাজদৃষ্টিতে সামাজিক-অভিপ্রায়ের অতিরিক্ত কোন রহস্য-জিজ্ঞাসা অথবা আধ্যাত্মিক আবেদন নেই—তাই তাঁর জীবনবাদ সমাজ-ঘনিষ্ঠ। সমাজ-নির্ভর জীবনের তিনি যে নূতন মূল্য নির্দেশ করেছেন, পরবর্তীকালের কথাসাহিত্যিকদের হাতে তারই বিচিত্রমুখী সম্প্রসারণ ঘটেছে। শরৎচন্দ্র পুরাতন সমাজ-জিজ্ঞাসার শেষ প্রতিনিধি ও আধুনিক সমাজ-জিজ্ঞাসার পথিকৃৎ—কথাসাহিত্যের দুই কালচিহ্নের মধ্যমণি ও সংযোগসূত্র।

॥ দুই ॥

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-রচনার কাল-পরিধি বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম চল্লিশ বছর। তখন "Age of interrogation"—সুরু হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের অধিকাংশেরই রচনাকাল যুদ্ধোত্তর যুগ। এই দ্বিধান্বিত ও প্রশ্নসঙ্কুল যুগের উত্তাপ শরৎসাহিত্যে একেবারে অনুপস্থিত এ কথা বলা যায় না। শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মধ্যে বঙ্কিম-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা-সুলভ দৃঢ়তা ও আদর্শ-নিষ্ঠতার অভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ জাতিগঠনের যুগ—তাই সে যুগে "চরিত্রের" প্রয়োজনীয়তা ছিল। বঙ্কিমসাহিত্যের নরনারী-চরিত্রে একটি প্রবলতা লক্ষণীয়—তাঁরা যেন সব সময় উঁচু সুরে বাঁধা। অর্ধশতাব্দী পরে শরৎচন্দ্র যখন উপন্যাস রচনা সুরু করেছেন, তখন বাংলা দেশের সমাজজীবন পরিবর্তিত। মধ্যবিত্ত সমাজের সামান্যতম মোহটুকুও ধূলিসাৎ হয়েছে। জোয়ারের দিনে যাকে শতবর্ণরঞ্জিত বলে বোধ হয়েছিল, ভাঁটার দিনে তার কঙ্কালসার জীর্ণমূর্তি চোখে পড়লো। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস সমূহ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত সমাজের কাহিনী—অধিকাংশ স্থলেই জমিদার বা ঐ জাতের সম্পন্ন সমৃদ্ধ শ্রেণীর পারিবারিক জীবনের কাহিনী। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসও ঐতিহাসিক উপন্যাসসুলভ রোমান্স থেকে একেবারে মুক্ত নয়। শরৎচন্দ্রের সম্পন্ন গৃহস্থরাও সাধারণ, অধিকাংশ স্থলেই বিলুপ্ত-বৈভব। তাঁরা আর যাই হোন না কেন, কৃষ্ণকান্ত রায়ের মতো বলতে পারেন না: "আমিই জজ, আমিই ম্যাজেষ্টর।" বঙ্কিমের উপন্যাসে নব-জাগ্রত ভূস্বামীবৃন্দের "শিভালরি"র কথা দূরকালের ইতিহাসের মতোই বর্ণরঞ্জিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের নায়করা যেন সদ্য ইতিহাস-প্রত্যাগত—তাই ইতিহাসের মধ্যযুগীয় গরিমার রং এখনো তাদের দেহে ও মনে। শরৎচন্দ্রে এসে তারা সেই অসাধারণত্ব হারিয়েছে। পায়ের নীচে যে কঠিন বনিয়াদ ছিল তাও ধীরে ধীরে ধীরে সরে গেল—মনের মদ শুকিয়ে এলো, তাই বাইরের মদ নিয়ে মাতলামি শুরু

হলো। তারা এখন বেকার, ভবঘুরে মাতাল—বাল্য প্রেমিক প্রতাপ পরিণত হলো দেবদাসে। এখন তাদের দিয়ে সন্তান-সম্প্রদায় গঠন করা অসম্ভব; তাদের বড় জোর সহানুভূতি দেখানো যায়—স্খলিত চরিত্রকে চোখের জলে একটু শোধন করা যায়। শরৎচন্দ্রের প্রশ্নচঞ্চল ঋজুদৃষ্টি সমাজ-জীবনের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সামাজিক ও পারিবারিক জীবন ছাড়া শিল্পীজীবনের অপরাপর ক্ষেত্রও আছে, কিন্তু সে জগৎ শরৎচন্দ্রের জিজ্ঞাসার অঙ্গীভূত নয়। সমাজ ও তথাকথিত প্রচলিত "ধর্মের" সম্পর্কে শরৎচন্দ্র জীবনকে নির্ণয় করেছেন।

সমগ্রভাবে সামাজিক রুগ্নতা ও শ্রীহীনতা শরৎসাহিত্যে ফুটে উঠলেও শরৎসাহিত্যের নরনারী-চরিত্রে তথাকথিত রুগ্নতা নেই। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে যে মনোবিকলন ও মানস-বিকৃতির ছবি ধরা পড়েছে, শরৎসাহিত্যে তা অনুপস্থিত। কিরণময়ীর মনোবিকারের চিত্র আছে, কিন্তু সেখানেও যেন সেই নগ্নতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। আসল কথা শরৎচন্দ্র যে সমাজকে দেখছেন, তখন সে ভাঙনের পথে চলেছে, কিন্তু তার চূড়ান্ত অবস্থা তখনও আসে নি। মধ্যবিত্ত সমাজে তখন দুর্বলতা এলেও, নানামুখী বিকৃতি দেখা দেয় নি। এই কারণেই আধুনিক যুগের সমাজচিত্রের তুলনায় শরৎ-চন্দ্রের সমাজচিত্র অপেক্ষাকৃত সহজ, অজটিল ও অরুগ্ন। কথাসাহিত্যের এই বিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়েই বাংলা দেশের সমাজ-জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। সহর ও সহরতলীর মানুষের রক্তহীন, পাণ্ডুর জীবনযাত্রা শরৎসাহিত্যের বিষয়বস্তু হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই আজকের মধ্যবিত্ত বুদ্ধি-জীবীর কাছে শরৎসাহিত্যের নরনারী নিষ্পাপ, অজটিল ও অরুগ্ন।

এতো গেল সামাজিক পরিবর্তনের কথা। শরৎচন্দ্রের জীবনদৃষ্টির দিক থেকেও প্রশ্নটি বিচার করা চলতে পারে। শরৎচন্দ্রের শিল্পবোধের একটি বড়ো দিক তার অপূর্ব কলা-সংযম। এই সংযমই শরৎসাহিত্যে লাবণ্যের সৃষ্টি করেছে। শরৎচন্দ্র মানবজীবনের যে অংশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তার এদিক ওদিক হলেই স্থূল হয়ে ওঠার সম্ভবনা ছিল। কিন্তু সতর্ক শিল্পী শরৎচন্দ্র শিল্পের সূক্ষ্মতার ও সৌকুমার্যের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটতে দেন নি। "গৃহদাহ" উপন্যাসে চলন্ত ট্রেনে অচলা ও সুরেশের আদিম বৃত্তি বহিঃপ্রকৃতিকে অবলম্বন করেই ফুটে উঠেছে: "বাহিরের মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল ঝড়জল তেমনিভাবেই সমস্ত প্রকৃতি লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুইটি অভিশপ্ত নরনারীর অন্ধ হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।" সংস্কার-স্বীকৃতি ও কলাসংযম—এই দুয়ের মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ করা অত্যন্ত দুরূহ। শরৎসাহিত্যে অনেকক্ষেত্রেই যাকে চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি আনুগত্য বলা হয়, তা আসলে হয়তো আর্টের সংযম। "চরিত্রহীন" উপন্যাসের কামিনী বাড়ীওয়ালীর বাড়ীর পঙ্কিল পরিবেশ ও দিবাকর-কিরণময়ীর জীবনযাত্রার অত্যন্ত বাস্তব-সমৃদ্ধ বর্ণনায় শরৎচন্দ্র অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। নরনারীর চূড়ান্ত অধঃপতনকেও শরৎচন্দ্র সংযমের সঙ্গে বর্ণনা করছেন। আরাকানের সেই বিবর্ণ পরিবেশে কিরণময়ীর মূর্ছাতুর অবস্থার একাধিক বর্ণনার মাধ্যমে শরৎচন্দ্র তার পরবর্তীকালের

মনোবিকারের মোটামুটি সঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আবার এর মধ্যে সংযমের পরিচয়ও আছে—এই ব্যাধিটিই কিরণময়ীকে ও লেখককে নগ্নতার চূড়ান্ত অসম্মান থেকে বাঁচিয়েছে। "চরিত্রহীন" উপন্যাসের চুয়াল্লিশ পরিচ্ছেদে যে চূড়ান্ত বিকৃতির চিত্র অপেক্ষা করে ছিল, সতীশের আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গে সে সম্ভবনা তিরোহিত হয়েছে। শরৎসাহিত্যের অনেকক্ষেত্রেই সংস্কার-স্বীকৃতি ও কলাসংযমের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। অত্যাচারী উচ্ছৃঙ্খল জীবানন্দের ঘরে মূর্ছিতা ষোড়শীর সেই অসাধারণ দৃশ্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শরৎচন্দ্রের কলাসংযম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান মন্তব্য মনে পড়ে: "আর্ট জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। কারণ সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার।" শরৎসাহিত্য প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি অত্যন্ত সঙ্গত।

॥ তিন ॥

"শরৎসাহিত্যে পতিতা"—এই কথাটি শরৎসাহিত্য সমালোচনায় অত্যন্ত বেশী ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে মনে হয় "পতিতা" শব্দটির যথার্থ অর্থ একটু অন্যভাবে দেখা হয়েছে। যে অর্থে বালজাক্, জোলা, কুপরিণ "পতিতা" উপন্যাস লিখেছেন, ঠিক সেই অর্থে শরৎচন্দ্র একখানাও "পতিতা" উপন্যাস রচনা করেন নি। বার্ণার্ড শ "মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রফেশ্যান"-এ ঠিক যে জাতীয় সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, শরৎচন্দ্র ঠিক তাও করেননি। এ ক্ষেত্রে পতিতা কথাটিই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। বার্ণার্ড শ তাঁর "মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রফেশ্যান" নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন: "Mrs Warrens Profession was written in 1894 to draw attention to the truth that prostitution is caused, not by female depravity and male licentiousness, but simply by underpaying, undervaluing, and overworking women so shamefully that the poorest of them are forced to resort to prostitution to keep body and soul together."—শরৎসাহিত্যে যদি কোন পতিতা থাকেন তো তা "prostitute"এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ নয়। শরৎচন্দ্র একমাত্র কামিনী বাড়ীওয়ালীর বাড়ীর পরিবেশ ছাড়া কোন বিকৃত ও কুৎসিত পরিবেশের চিত্র আঁকেন নি। এক চন্দ্রমুখী ছাড়া যথার্থ পতিতা শরৎসাহিত্য নেই। আর যারা আছে তারা সমাজিক যন্ত্রের পেষণে বিকল হয়ে আছে। শরৎসাহিত্যে এই কারণেই যথার্থ পতিতা থাকা সম্ভব নয়।

শরৎচন্দ্র পতিতা-সাহিত্য রচনা করেছেন, এ কথা না বলে তিনি নারীর অভিনব মূল্য নির্দেশ করেছেন, এ কথা বলা বোধহয় অধিকতর সঙ্গত। তাঁর "নারীর মূল্য" গ্রন্থের প্রথমেই যে বেদনাতুর মন্তব্য করেছেন, তা থেকেই তাঁর জীবনদর্শন উপলব্ধি করা যায়: "জল জিনিষটি নিত্য প্রয়োজনীয় অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখন ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি এক ফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। তেমনি—ঈশ্বর না করুন—যদি কোন দিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেই দিনই ইঁহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে—আজ নহে। আজ ইনি সুলভ।" শরৎচন্দ্রের নারীর মূল্য নির্ধারণের

পশ্চাতে শুধু সুলভ ভাবাকুলতাই নেই। দীর্ঘকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তিনি একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শরৎচন্দ্রের পত্রাবলীর মধ্যেও বহু জায়গায় এর প্রমাণ আছে। এক সময় শরৎচন্দ্র সমাজ-নির্যাতিতাদের অনেকগুলি কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন "নারীর মূল্য" গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে।

নারীর মূল্য নির্ধারণে সহানুভূতিমিশ্র হৃদয়াবেগ ও যুক্তিবাদ—দুয়েরই বাঞ্ছিত মিলন ঘটেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে যথার্থভাবে যাচাই করার জন্য সবচেয়ে বেশী পড়েছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সার। তাঁর "নারীর মূল্য" গ্রন্থে তিনি স্পেন্সারের "প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব্ সোশিওলজি" গ্রন্থ থেকে বহুস্থান উদ্ধার করে তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন। ইংরেজ-দার্শনিকের তথ্যসমৃদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনা শরৎচন্দ্রের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এক জায়গায় স্পেন্সারের সঙ্গে তাঁর একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। স্পেন্সারের দৃষ্টি তথ্যসন্ধানী নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, কিন্তু শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি মমতাতুর শিল্পীদৃষ্টি। তাই শরৎচন্দ্রের মানবিক চেতনা তাঁর ব্যক্তিচরিত ও শিল্পীমানসের এক মৌলিক অধিকার। তাই শরৎচন্দ্র স্পেন্সার-সংগৃহীত তথ্যের ওপর টিপ্পনী ও মন্তব্য করতেও ছাড়েন নি। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন: "এদেশেই সম্পত্তির লোভে গুরুজনকে বাঁধিয়া পোড়ানো হইত। অথচ পুরুষের নানাবিধ জবাবদিহি Spencer সাহেবের পুস্তকে লেখা আছে,—"It was adopted as a remedy for the practice of poisoning their husbands, which had become common among Hindoo women"—খবরটি কোন্ পণ্ডিত তাঁহাকে দিয়াছিল জানিনা, কিন্তু পোড়ানের ধরণ ধারণ দেখিয়া সে বেচারা বিদেশীর চোখে বোধ করি নারীর এমনি একটা কিছু গুরুতর অপরাধের কথাই সম্ভবপর বলিয়া ঠেকিয়াছিল। হায়রে, পুড়িয়া মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই!" (নারীর মূল্য, দ্বিতীয় সং, পৃঃ ১০১) শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকেই তাঁর মৌলিকদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ-বিজ্ঞানীর যুক্তিনিষ্ঠা ও সহৃদয় মানবিক চেতনা শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।

যে সব সমস্যার কথা তিনি তুলেছেন সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার আবেদন কমে এসেছে। তাই "অরক্ষণীয়া" বা "বামুনের মেয়ের" সমস্যা আজ এক বিলীয়মান যুগের কাহিনী বলে মনে হয়। কিন্তু সেই বিশেষ কালের ও বিশেষ যুগের পটভূমিকায় তিনি মানুষের জীবনের যে তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন, তা দেশকালাতীত একটি চিরন্তন সত্য। মানুষ হিসেবেই দোষত্রুটি সত্ত্বেও মানুষের যে একটি মৌলিক পরিচয় আছে শরৎচন্দ্র সমগ্র জীবনব্যাপী তারই অভ্রান্ত মূর্তি দেখছেন। শরৎচন্দ্রের প্রতিটি রচনায় যে সুপ্রচুর মানবধর্ম স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে, তা শুধু সাহিত্যেরই নয়, একটি জাতির চিন্তা-চেতনার ইতিহাসে এক অভিনব সম্পদ। বিশেষ কোন মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, একেবারে স্বাভাবিক মানুষের সুস্থ জীবনবোধ থেকেই শরৎচন্দ্র এই দৃষ্টি পেয়েছেন। শরৎচন্দ্রের এই উদার মানবীয় চেতনার দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় জীবনকে দেখলে সব কিছু মিলিয়ে একটি গোটা মানুষকে পাওয়া যায়। সহজ সুস্পষ্ট গদ্যরীতি, যেন শরৎচন্দ্রের সেই মানবীয় চেতনারই যথার্থ ভাষা। তাই শরৎচন্দ্রের শব্দ-নির্বাচন, বিশেষণ-প্রয়োগসমূহ এতো

যথার্থ। তাঁর গদ্যরীতি জীবনদর্শনের বাণীবাহক। এই রীতির মধ্যেই যেন মানুষ শরৎচন্দ্রের আন্তরিক প্রকাশ। তাই বাংলা দেশের বিশেষ কালের বিশেষ অঞ্চলের মানুষের মধ্য দিয়েই শরৎচন্দ্র বিশ্বরূপ দেখেছেন। এখানে তিনি বিশেষ কালের হয়েও চিরকালের, সঙ্কীর্ণ-পরিসর হয়েও গভীরস্পর্শী, খ্যাতকীর্ত্তি শিল্পী হয়েও মানুষ। তাই তাঁর উপন্যাসের নায়কনায়িকারা নির্মম, কুটিল, চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল, ভবঘুরে যাই হোক না কেন, তাদের সবার আড়ালে একটি করুণ-কোমল দৃষ্টির সজল আলো তাদেরই সঙ্গে চলেছে। সে দৃষ্টি মানুষ শরৎচন্দ্রের। শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে এ যুগের শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিষ্ট। গণতান্ত্রিক ভাবনা ও মানবিক চেতনার সম্প্রসারণের যুগে শরৎচন্দ্রের উদার দৃষ্টিই আমাদের পথ দেখাবে।

সৎকার

রণজিৎকুমার সেন

ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং·—

আবার বেজে উঠলো টেলিফোনটা।

রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন বৃদ্ধ বিষ্ণুচরণবাবু। —'হ্যালো—'

—'আজ্ঞে আমি চক্রবেড়িয়া রোড থেকে বলছি, ১৬১ নম্বর চক্রবেড়িয়া রোড।' কম্পিত কণ্ঠের ত্রস্ত উচ্চারণ। —'একটি ফিমেল ডেড বডির জন্য বলছি। বিকেলে এক্স্‌পায়ার করেছে, আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই। এখনই যদি অনুগ্রহ করে আপনাদের একটা ভ্যান পাঠিয়ে দেন—'

—'হ্যালো' কত নম্বর বাড়ী বললেন?' কানের পাশে আরও কিছুটা শক্তভাবে রিসিভারটাকে চেপে ধরলেন বিষ্ণুচরণবাবু।

ওপাশ থেকে আর-একবার সেই কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ হলো: 'আজ্ঞে, ১৬১ নম্বর চক্রবেড়িয়া রোড।'

—'কি হয়েছিল? রোগটা কি?'

—'সামান্য দু-একদিনের জ্বর, হয়তো মেনিন্‌জাইটিসের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।'

—'আপনি তার কি হন?' বিষ্ণুচরণবাবুর নিজের কাছেই এবারে নিজের উক্তিটা নতুন বলে ঠেকলো। সারাদিনে এমন কত টেলিফোনই তো আসে, এমনি করে প্রশ্ন বা জেরা তিনি কাউকে কখনও করেননি। নতুন করে আর একবার তিনি সেই একই প্রশ্ন করলেন, 'মৃতা ব্যক্তির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?'

—'সম্পর্ক আবার কি! এ বাড়ীটায় পাঁচ ঘর ভাড়াটে থাকে, আমিও এক ভাড়াটে। ভদ্রমহিলা একাই এখানে থেকে গানের মাষ্টারী করতেন, সঙ্গে দেখতাম ঝি থাকতো একটি।'

—'আচ্ছা, পাঠাচ্ছি ভ্যান।' রিসিভারটা রেখে দিয়ে রেজিষ্ট্রি খাতাখানি হাতের কাছে টেনে নিয়ে নাম টুকে রাখতে গেলেন বিষ্ণুচরণবাবু, এবং তক্ষুনি নিজের অজান্তে জিভের উপর একটা সলজ্জ কামড় বসে গেল দাঁতের। সবই জিজ্ঞেস করা হলো, অথচ আসলে নামটাই জিজ্ঞেস করা বাকি থেকে গেল। এতদিনে সম্ভবতঃ এই প্রথম একটা ভুল করলেন বিষ্ণুচরণবাবু। কিছুক্ষণ কেমন অন্যমনস্কের মতো বসে রইলেন তিনি। তাকিয়ে দেখলেন—দেয়ালের ঘড়িতে সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে এসে কাঁটা দাঁড়িয়েছে। কখন যে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, লক্ষ্যে পড়েনি তাঁর। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় সারা আকাশ রেঙে উঠেছে। চারপাশে কেমন সুন্দর একটা মিষ্টি আবহাওয়া। মনটা যেন পাখী হয়ে আকাশে উড়ে যেতে চায়। কিন্তু তক্ষুনি আবার কর্ত্তব্য কাজে সচেতন হয়ে ওঠেন

বিষ্ণুচরণবাবু। খাতাখানি বুজিয়ে রেখে হাঁক দেন তিনি : 'সত্যবাবু, সত্যবাবু কি ফিরে এসেছেন ?'

—'হ্যাঁ এসেছি।' সামনে এসে দাঁড়ায় সত্যজিৎ। —'আবার কোথাও থেকে রিং করলো নাকি কেউ ?'

—'হ্যাঁ, বিকেলের এক্স্‌পায়ারিং, রিং পেলামই দেরী করে। একটু দূর হবে, তবু এমন বিশেষ রাত হয়নি। সতীশকে বরং সঙ্গে নিয়ে যান, প্রয়োজন হলে ষ্টিয়ারিংয়ে হাত বদল করে নিতে পারবেন।' থেমে বিষ্ণুচরণবাবু বললেন, '১৬১ নম্বর চক্রবেড়িয়া রোড, নোট করে নিন। বড়ি সোজা কেওড়াতলায় নিয়ে যেতে পারবেন।'

সত্যজিৎ বললো, 'ফিরে এসে আপনাকে তবে আর পাচ্ছি না আজ, কি বলেন ?'

—'না বারোটার পরে আর অপেক্ষা করবো না, শুয়ে পড়বো গিয়ে।' বলে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ বৃদ্ধ বিষ্ণুচরণবাবু। মনে হলো—বড্ড ক্লান্ত তিনি।

আর অপেক্ষা করলো না সত্যজিৎ। সোজা এসে আবার সে ষ্টিয়ারিংএ হাত রেখে ভ্যানে এসে চেপে বসলো। কী একটা গানের শীষ বাজাতে বাজাতে ওপাশে এসে বসে পড়লো তার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছোক্‌রা সতীশ, বললো, আঃ—কি চমৎকার রাতটা আজ, বলুন তো সত্যদা ?'

—'হ্যাঁ, চমৎকারই বটে।' ম্লান একটুকরো হাসি মিলিয়ে গেল সত্যজিতের ঠোঁটের ফাঁকে।

স্টার্ট পড়লো ভ্যানে।

সৎকার সমিতির অফিস। এমনি করেই ভ্যানে স্টার্ট পড়ে সকাল থেকে রাত অবধি। কোথায় কোন্ নিরাশ্রিতের মৃত্যু হলো, ফোনে বা লোকমুখে জানামাত্রই স্টার্ট পড়লো অমনি ভ্যানে। এই জাতীয় সব মৃতদেহগুলির ভার নিয়ে চলেছে এই সৎকার সমিতি। নিজেদের গাড়ীতে করে তারা মৃতদেহ নিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করে ফেরে। ভ্যানের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা : 'জাতীয় সৎকার সমিতি।' ভ্যান নিয়ে সৎকারের কাজে ছুটোছুটি করে সত্যজিৎ, সতীশ, সঙ্গে আরও দুজন। অফিসের ইন্‌চার্জ্জ হয়ে বসে আছেন বৃদ্ধ বিষ্ণুচরণবাবু। আজ আর বড় বেশী নড়েচড়ে কাজ করবার মতো শক্তি বা সামর্থ্য নেই তাঁর। অবকাশ মতো বসে বসে মাঝে মাঝে সুখ-দুঃখের আলাপ করেন সত্যজিতের সঙ্গে। এখানে সত্যজিৎই তাঁর একমাত্র আলাপ-আলোচনার সঙ্গী। শিক্ষা আছে, মার্জ্জিত রুচি আছে সত্যজিতের, সেইসঙ্গে সমাজ-সেবায় মহৎ ত্যাগও আছে তার।

ত্যাগ আছে আত্মবিলয়ের, মাথা উঁচু করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দাঁড়াবার, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেবার ত্যাগ। কিন্তু এ-কথাটা বড়-বেশী মনে এসে দাগ কেটে যায় না সত্যজিতের। মাঝে মাঝে মনে পড়ে পুরনো দিনগুলোর কথা—আজকের মতো এমন সুন্দর ফুটফুটে জ্যোৎস্না-রাতে যখন নির্জ্জন শান-বাঁধানো ঘাটে বসে প্রাণ ভরে সে তার বাঁশের বাঁশী বাজাতো, দূরে কারুর বাগানে মৃদু মৃদু বাতাসে কাঁপতো রজনীগন্ধার ঝাড়। আজ সেই জ্যোৎস্না, সেই রজনীগন্ধা বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেছে তার জীবনে। আজ তার প্রতিদিনের যে জীবন, তা শুধু কর্ত্তব্যবোধ আর নিয়মানুবর্ত্তিতার রুটিনে বাঁধা। কত জ্যোৎস্নার মতো মুখ, কত রজনীগন্ধার মতো কমনীয় দেহ আজ সে ভ্যানে করে টেনে নিয়ে নিয়ে ফেলছে শ্মশানে। তার উপর ক্রমাগত সাজিয়ে দিচ্ছে প্রজ্জ্বলন্ত-

অগ্নিমুখী চিতা। বাঁশীর সুর এখানে বিষাদের কান্না হয়ে গঙ্গার ধারায় মিশে যাচ্ছে। কেওড়াতলা, নিমতলা, কাশী মিত্রের ঘাট—এখানে তেমনি করে বসে বসে বাঁশী বাজাবার জীবন কোথায়, জ্যোৎস্না থেকেও প্রাণোৎসবের সেই সহস্রদীপা আলো কোথায় ? জীবনাবসানের একটা মুহ্যমান দীর্ঘশ্বাস মাত্র চাপা গোঙানীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে, দিনাবসানের রুদ্ধ ক্লান্তিতে বাতাস এখানে মন্থর।

ভ্যানে স্পীড বাড়ছে একটু একটু করে, আর তেমনি ধীরে ধীরে স্পীড বাড়ছে সত্যজিতের মনে। বৌবাজার ছাড়িয়ে, গণেশ এভিনিউকে ডাইনে রেখে, ভ্যান এসে পড়লো ওয়েলিংটন পার্কের পাশে। হঠাৎ পাশ থেকে কথা বলে উঠলো সতীশ : 'ভেবেছিলাম, সন্ধ্যার পর আজ আর কাজে বেরোতে হবে না। গাছের আড়াল থেকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে চাঁদটাকে, দেখুন সত্যদা। ইচ্ছে করে সারারাত পার্কে পড়ে থাকি। কি বলেন, ইচ্ছে করে না ?'

—'ইচ্ছেটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তোমার মনের ভাব আমি কি করে বলবো ?' —পাশ ফিরে তাকালো একবার সত্যজিৎ।

—'তা হলেও সকলের মনের মধ্যে একটা তো কমন ইচ্ছা থাকেই !'

—'থাকে নাকি ?' গিয়ারটাকে একবার ঠেসে ধরে স্টিয়ারিংটাকে যথাসম্ভব ডানদিকে ঘুরিয়ে নিল সত্যজিৎ। ভ্যান চলতে লাগলো ধর্ম্মতলা দিয়ে।

সতীশ বললো, 'আপনি যেন কি রকম সত্যদা ! ক্রমেই মেসিন হয়ে যাচ্ছেন।'

—'না হয়ে উপায় কি !' সতীশের মুখের দিকে আর-একবার চোখ তুলে তাকালো সত্যজিৎ। —'দেখতেই তো পাচ্ছো, মনটা কবি হলে নিজের হাতে চিতা সাজানো শক্ত হয়। এখানে মেসিন হওয়াই দরকার।'

নিজের মধ্যে খানিকটা যেন দমে গেল এবারে সতীশ। বললো, 'নাঃ, আপনাকে বলে লাভ নেই, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না আমার কথা।'

কিছু-একটাও জবাব দিলনা এবারে সত্যজিৎ। শুধু ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু একটুকরো হাসি টেনে চোখ দুটোকে আবার সামনের দিকে নিবদ্ধ করলো। এখনও দীর্ঘপথ বাকি। ঘড়িতে এখন আটটা কুড়ি, চক্রবেড়িয়া রোডে গিয়ে বাড়ী চিনে পৌছাতে আরও অন্ততঃ মিনিট কুড়ি তো লাগবে বটেই। আরও কতকটা স্পীড বাড়ালো সত্যজিৎ ভ্যানের।

—হল্ট।

হঠাৎ একটা নিষেধাজ্ঞা স্পষ্ট হয়ে উঠলো চোখের সামনে। লাল বাতি জলে উঠলো ট্রাফিক পোষ্টের গায়ে। থিয়েটার রোড আর চৌরঙ্গীর ক্রসিং। দুটো পা ঠিক সমানে গিয়ে চেপে ধরলো ভ্যানের প্লাস আর ব্রেকটাকে।

—'দেখলে তো সতীশ, আকাশে চাঁদ থাকলে কি হবে, পথের আলোনিয়ন্ত্রণ একেবারে স্বতন্ত্র ব্যাপার। ইচ্ছে করে কি মেসিন হতে হয় মানুষকে ! কবিতা আর গানের সুর বেশীক্ষণ টেকে না আমাদের জীবনে।'

—'রাখুন আপনার কথা। ভালো লাগছে না শুনতে।'

মনে মনে সেই থেকে কেমন যেন একটা বিশ্রী বোধ করছে সতীশ।

নিজের মনে স্বগতভাবে একবার উচ্চারণ করলো সত্যজিৎ : 'ইউ আর ট্যু ইয়ং টু কন্‌সিভ্‌ লভ্‌ এ্যাণ্ড বিউটি।' মুখে জিজ্ঞেস করলো, 'জীবনে কোনোদিন কাউকে ভালোবেসেছ সতীশ, কোনো মেয়েকে ?'

বিরক্তির সঙ্গে আকস্মিক একটা লজ্জার সুর মিশে গলার শব্দটাকে যেন এবারে কেমন করে দিল সতীশের। বললো, 'যান, আপনি আজ কি সব আরম্ভ করলেন, বলুন তো ?'

মুখ টিপে হেসে সত্যজিৎ বললো, 'এইখানেই তো আত্মপ্রতারণা। ভালোবাসা জিনিষটা ঠিক ঐ আকাশের চাঁদের মতই স্বচ্ছ, নির্ম্মল আর মিষ্টি। ভালোবেসে গোপন করে যাবার মতো ভীরুতা আর পাপ নেই জগতে।' থেমে সত্যজিৎ বললো, 'মনে হচ্ছে অজস্র ভালোবাসা এক একটি জোনাকী হয়ে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার মনের মধ্যে। প্রাণে ভালোবাসা না থাকলে জ্যোৎস্নাকে এমন সুন্দর বলে মনে হয় না। এইখানেই তো মানুষের জীবনের কাব্য, জীবনের জীবনীশক্তি।'

ফিলজফি জানে না সতীশ, কিন্তু মনে মনে অনুভূতি আছে প্রচুর। যাকে সে ভালোবাসে, বাড়ীর গবাক্ষপথে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে সে তার আসা-পথ চেয়ে। চড়কডাঙ্গার সৎগোপদের মেয়ে মালিনী। কিন্তু সেকথা কি করে মুখে আনে সতীশ ? লজ্জা এসে বাধা দেয় সেকথা সত্যজিতের সামনে বলতে।

আবার মোশন নিলো গাড়ী। ট্রাফিক পোষ্টের সব চাইতে নিচেকার বালবটা জ্বলে উঠলো হঠাৎ, নীল বালব : গাড়ী চলাচলের ছাড়পত্রের প্রতীক।

পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালটা মুছে নিতে নিতে সত্যজিৎ বল্‌লো, 'কলকাতার রাস্তার আর গাড়ী চালানো যাবে না দেখছি। যে ভিড়, মিথ্যে দেরী হয়ে গেল এখানেই।'

সতীশ চুপ করেই ছিল, এবারও চুপ করেই গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে সত্যজিৎ জিজ্ঞেস করলো, 'কি, কথা বলছো না যে! শক্‌ পেলে নাকি আমার আগেকার কথাটায় ?'

অস্ফুটকণ্ঠে এবারে সতীশ বললো, 'না, শক্‌ পাবো কেন! আপনার কথাই এতক্ষণ ভাবছিলাম খানিকটা।'

—'আমার কথা!' হঠাৎ যেন আঁতকে উঠলো সত্যজিৎ।—'আমার কথা কেউ আবার ভাবে নাকি দুনিয়ায় ? আর—কীই বা ভাববে এমন! তুমি তো বড্ড সিল্যি দেখতে পাচ্ছি!'

—'হয়তো তা-ই হবে!'—বলতে গিয়ে হঠাৎই আবার থেমে গেল সতীশ। চোখে পড়লো তার—গাড়ীর গতির সঙ্গে সঙ্গে আকাশের চাঁদটাও যেন ক্রমেই এগিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে!

ভ্যান এসে দাঁড়ালো চক্রবেড়িয়া রোডে। বাড়ীটা চিনে নিতে দেরী হলো না। গাড়ীটাকে দেখতে পেয়ে এতক্ষণে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বাঁচলো অন্যান্য ভাড়াটেরা। মৃত-

দেহটিকে নিয়ে কম উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগে কাটেনি তাদের বিকেল থেকে। কত বাড়ীতে গিয়ে কত ভাবের কান্নায় আছড়ে পড়তে দেখেছে সত্যজিৎ কতজনকে, কিন্তু এখানে তার কিছুমাত্র আভাস নেই। শান্ত সমাহিত পরিবেশ। সব যায়গাতেই চটপট কাজ সেরে ফেলতে অভ্যস্ত সত্যজিৎ। ষ্টিয়ারিংয়ে হাত রেখেই সতীশকে একবার তাড়া দিল সে : 'যাও, বডি আনবার ব্যবস্থা করো ভিতরে গিয়ে।'

উঠে পড়লো সতীশ, বললো, 'ষ্ট্রেচার নিয়ে চলুন না দুজনেই ঢুকে পড়ি একসাথে!'

—'বেশ, চলো।'

বলে সঙ্গে সঙ্গে সত্যজিৎও ষ্টিয়ারিং ছেড়ে উঠে পড়লো।

ষ্ট্রেচার না হলে মেয়েদের ডেড বডি তুলতে অসুবিধে হয় গাড়ীতে। শুধু মেয়েদের কেন, ভদ্র পরিবারদের জন্যই বিশেষভাবে এই ষ্ট্রেচারের ব্যবস্থা। রাস্তার বা হাসপাতালের মৃতদেহগুলির জন্য ষ্ট্রেচারের হাঙ্গামা পোহাতে হয় না, পরিধানের কাপড়ে বেঁধেই উঠিয়ে এনে তোলা যায় গাড়ীতে।

ষ্ট্রেচার নিয়ে মাইলাটির মৃতদেহের পাশে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ আঁত্‌কে উঠলো সত্যজিৎ। এ কি, সুমিত্রা না ? সুমিত্রার তবে আজ এই পরিণতি, এম্‌নি করে আজ তবে নিরাশ্রিতের মতো মরতে হলো সুমিত্রাকে ? মাটি যেমন করে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে ভূমিকম্পে, তেমনি করেই কেমন একটা ভীষণ বেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো সত্যজিতের সমস্ত দেহটা। কথা বলতে গিয়ে সহসা গলা আটকে এলো, মনে হলো না যে, আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে সে।

পাশে এসে একবার শোক প্রকাশ করলো সেই ঝিটি : 'কী যে চমৎকার মেয়ে ছিল আমার দিদিমণি, কাকে বলবো। দুঃখ-কষ্ট কোনোদিন তার গায়ে মাখতে দেখিনি। হাসি-হাসি মুখখানি ছিল সব সময়, আর তেমনি ছিল গানের গলা।'

মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে একবার শক্ত করতে চেষ্টা করলো সত্যজিৎ। জিজ্ঞেস করলো : 'কি নাম ছিল তোমার দিদিমণির, দেশ ছিল কোথায় ?'

—'আজ্ঞে, দিদিমণির নাম তো জানি দুটো ছিল।' ম্লান অধরে ঝিটি বললো, 'বাপের বাড়ীর নাম ছিল সুমিত্রা দেবী, দিদিমণির মুখেই একদিন কথাচ্ছলে শুনেছি। আর এখানে নাম ছিল সাধুমা, সতীসাধ্বীর মতই থাকতেন। বাড়ী শুনেছি নন্দনপুরে। তিন বছর কাটালাম আমি দিদিমণির সঙ্গে, এর বাইরে তো আর কিছু জানিনা!'

মিলে গেল তবে অক্ষরে অক্ষরে। সুমিত্রা বলে চিনতে এখন এতটুকুও কষ্ট হচ্ছে না। অনিন্দ্যকান্তি দেহটি পড়ে আছে একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মতো, মুখে এসে ঠিকরে পড়ছে চাঁদের আলো, সে-আলো যেন এই পাণ্ডুর মুখখানির তুলনায়ও ম্লান বলেই মনে হয়। শুনেছিল সত্যজিৎ—রামনগরে বিয়ে হয় সুমিত্রার, কিন্তু বিবাহিত জীবন তার সুখের ছিল না। স্বামীটি তার পুরোদস্তুর অত্যাচারী ও অবিমৃষ্যকারী। তারই শেষ পরিণতি এসে মিলেছিল সম্ভবত আজকের এই আত্মীয়-বান্ধবহীন নিরালম্ব জীবনে!

হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ সতীশ। এবারে নিজেই উদ্যোগী হয়ে ডেড বডিটাকে

সমান্তরালভাবে তুলে শুইয়ে দিল ষ্ট্রেচারের উপর। বললো: 'ধরুন ওপাশে সত্যদা, ক্রমেই রাত্রি হয়ে যাচ্ছে।'

—'হ্যাঁ, রাত্রি হয়েই যাচ্ছে বটে, ধরো।' বলে নিজের দিকে ষ্ট্রেচারের হাতলে হাত স্পর্শ করলো সত্যজিৎ। কিন্তু শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরতে পারলো না। কেমন যেন অসার লাগছে হাতের কব্জি আর আঙুলগুলোকে।

কোনোভাবে বডিটাকে ভ্যানে তুলে নেওয়া হলো।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কেমন একটা অবসন্নতার মেঘ জমে উঠেছে সমস্ত মনের উপর দিয়ে। নিষ্প্রভ কণ্ঠে সত্যজিৎ বললো, 'স্টিয়ারিংয়ে আর হাত চলছে না সতীশ, নিজে এসে বসো এবারে হুইল ধরে। হঠাৎ কেমন যেন অস্থির লাগছে, মাথাটা ঘুরচে বোঁ বোঁ করে। পারবে না কেওড়াতলায় গিয়ে নিজে সব ম্যানেজ করে নিতে? আমি তবে বাসে করেই ঘরে ফিরে শুয়ে পড়তে পারি গিয়ে। নইলে আমার জন্তেও সম্ভবত আর-একটা চিতার দরকার হবে।' তারপর একটুকাল থেমে বললো: 'একা কি শেষ পর্য্যন্ত দুদিক সামলাতে পারবে তুমি?'

অবাকবিস্ময়ে একবার চোখ দুটো তুলে ধরলো সতীশ সত্যজিতের মুখের দিকে। দেখলো— ক্লান্তিতে মুখের চেহারা এরই মধ্যে কেমন বদলে গেছে তার। কথাটার যথাযথ উত্তর না দিয়ে শুধু বললো, 'তবেই তো দেখতে পেলেন সত্যদা, মানুষ কখনও মেসিন হতে পারে না। সেই সকাল থেকে একটুও বিশ্রাম নেই আপনার। অমনি করে কেউ পারে?'

বুঝলো না সতীশ—কেন পারে না, কেন পারছেনা এই মুহূর্ত্তে আর এক পা-ও এগোতে সত্যজিৎ। সমস্ত ঘটনা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে একসঙ্গে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো তার মনে।···

···সেই নন্দনপুরের জীবন। বাঁশী বাজানো নিয়েই প্রথম আলাপ সুমিত্রার সঙ্গে। ক্রমে সেই আলাপ ভালোবাসার সুরভিতে মঞ্জুরিত হয়ে উঠলো।

সুমিত্রা বললো, 'তোমার মতো যদি বাঁশী বাজাতে পারতুম সত্য, তবে আর আমার কোনো আকাঙ্খাই থাকতো না।'

জবাবে সত্যজিৎ বলেছিল, 'তোমার মতো গানের গলা পেলে বাঁশীর সুরকে হার মানিয়ে দিতাম মিতা।'

এমনি করেই এগিয়ে চলতো দিন। বাঁশী বাজাতো সত্যজিৎ, আর গান গাইতো সুমিত্রা। গানের সাথে সাথে সুর হয়ে ভেসে উঠতো হৃদয়। সেই হৃদয়ের স্বাক্ষরই একদিন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মনের কথাটাকে বুকের আড়ালে লুকিয়ে রাখলো না সুমিত্রা, বললো, 'আমরা কি আরও কাছের করে পেতে পারি না দুজনে দুজনকে?'

দ্বিধামুক্তকণ্ঠে সত্যজিৎ বলেছিল, 'তোমার ইচ্ছে। লগ্ন এলে যথাসময়েই আমি রজনীগন্ধার মালা নিয়ে অপেক্ষা করবো তোমার জন্তে।'

করেছিলও বৈ কি সেই অপেক্ষা সত্যজিৎ! কিন্তু কেন যেন হ'লো না তেমনি নিবিড় করে পাওয়া। কারণটা ঘটলো অভিভাবক মহল থেকে: পল্লীবাংলার চিরকালের সেই সনাতন রক্ষণশীল

অভিভাবক। অন্ধকার-পথে হোঁচট খাবার মতই জীবনে সেই প্রথম প্রকাণ্ড একটা হোঁচট খেলো সত্যজিৎ। তা থেকে নিজেকে সামলে নেওয়া কঠিন ছিল সেদিন। কেমন যেন তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল জীবনটা। বাঁশী আর সুর হয়ে বাজতে চাইলো না। কোথাও কোনো একটা মুহূর্ত্তের জন্তও ভালো লাগলো না নিজেকে নিয়ে। একদিন কানে এলো, বিয়ে হয়ে গেছে সুমিত্রার। অন্ততঃ সুখী হওয়া উচিত ছিল তার, কিন্তু শুনলো—সুখ তার ভাগ্য থেকে চিরদিনের মতো সরে দাঁড়িয়েছে। আজকের এই জীবনটা কি সত্যিই কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিল সুমিত্রা? অন্ততঃ কলকাতায় আছে জানলেও যথাসময়ে এসে তার দুঃখের কিছুটাও ভাগ নিতে পারতো সত্যজিৎ। কিন্তু এমনি করে মরবে বলেই হয়তো সে তিলে তিলে প্রস্তুত হচ্ছিল। নীরবে নির্ব্বিবাদে আজ সে পৃথিবী থেকে সরে দাঁড়ালো। এখনও তার একটা গান মনে পড়ে। নজরুল-সঙ্গীত। কী দরদ আর অদ্ভুত শব্দোচ্চারণে গাইতো সুমিত্রা—

'কেউ ভোলে, কেউ ভোলে না
অতীত দিনের স্মৃতি,
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে,
কেউ ভুলিতে গায় গীতি।'···

আজ সে চিরজীবনের অশ্রুতে ভিজিয়ে দিয়ে গেল তার প্রাণ-পুরুষকে। কোন প্রাণে সে আজ নিজের হাতে সাজিয়ে দেবে সুমিত্রার চিতাশয্যা?

ভ্যানে স্টার্ট দিয়ে সতীশ বললো, 'যাহোক্ করে আমি ম্যানেজ করে নেব'খন, আপনি বরং আর অপেক্ষা না করে 'টু' কিম্বা 'টু-এ' বাস ধরে সোজা বাড়ী চলে যান। আপনার আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না সত্যদা।'

অপেক্ষা সত্যিই আর করতে পারে না সত্যজিৎ। বললো, 'তুমি এসে স্টিয়ারিংএ বসো সতীশ, আমি আর-একবার বডিটাকে দেখে নিয়ে দরজা এঁটে দিচ্ছি পিছনের।'

ভ্যানের পিছন দিকের অন্ধকার ডেড-সেলের মধ্যে হামা দিয়ে ঢুকে পড়লো সত্যজিৎ, নীরবে একবার অধর স্পর্শ করলো সুমিত্রার পরিত্যক্ত দেহের পাণ্ডুর ললাটে। চিরকালের ভালোবাসা তার অম্লান অটুট হয়ে থাক্ সুমিত্রার নামের সঙ্গে। তারপর বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজাটা ভালো করে এঁটে দিয়ে বললো, 'আচ্ছা, আসি তবে সতীশ।'

স্টিয়ারিং হুইলটা অর্দ্ধগোলাকৃতভাবে ঘুরে এলো খানিকটা। চলতে সুরু করলো ভ্যান। জ্যোৎস্না এসে ঠিক্‌রে পড়েছে সতীশের গায়ে। মনে পড়ছে তার মালিনীকে: চড়কডাঙার সৎগোপদের মেয়ে মালিনী। আজকের এমন সুন্দর জ্যোৎস্নাটা ব্যর্থ হয়ে গেল তার জীবনে।···

পরদিন বিষ্ণুচরণবাবুর হাতে হঠাৎ একটুক্‌রো চিঠি এসে উপস্থিত। —'এতদিনের সব কাজের মধ্যে সম্ভবত আত্ম-সৎকারটাই বাকী ছিল! মনেরও একটা দেহ আছে। তাকে আজ নিঃশেষ করে দিতে পেরেছি। এবারে ছুটি নিচ্ছি আপনার কাছে।'

সত্যজিতের লেখা।

পড়ে কিছুই বুঝতে পারলেন না বৃদ্ধ বিষ্ণুচরণবাবু। অভিভূতের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি চিঠিখানির অক্ষরগুলোর দিকে।

সেই মুহূর্তে বেজে উঠলো আবার টেলিফোনটা : ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং—।

শ্লথ হাতে রিসিভারটাকে তুলে নিয়ে রেজিষ্ট্রি খাতা খুলে বসলেন বিষ্ণুচরণবাবু।

মণিপুরী নৃত্য

শ্রীমতী ঠাকুর

মণিপুরী নৃত্য নামে সুপরিচিত নৃত্যটি আসলে মণিপুরের রাসনৃত্যের কিঞ্চিৎ হেরফের। পাহাড়ঘেরা এই ছোট দেশটির বাইরে যাঁরা মণিপুরের বিভিন্ন প্রকার নৃত্যশৈলীর সঙ্গে পরিচিত তাঁদের সংখ্যা নেহাৎই অঙ্গুলিমেয়। মণিপুরের অধিবাসীদের জীবনে এই নৃত্যগুলি আজও এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যেমন, এখানেও তেমনি নৃত্য জনসাধারণের দৈনন্দিন এবং ধর্ম-জীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। প্রাচীন নৃত্যগুলি শিব-পার্ব্বতীর পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে রচিত। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী নৃত্যের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

মণিপুরে প্রধান চারটি নৃত্যরীতি প্রচলিত : (১) লাইহারাবা ও ক্লাসিকাল, (২) অস্ত্রবিদ্যা, (৩) চলন-গঠন এবং (৪) রাসলীলা।

এদের মধ্যে লাইহারাবা হচ্ছে মণিপুরের সবচেয়ে প্রাচীন নৃত্যরীতি। লাইহারাবা শব্দটির অর্থ হচ্ছে দেবতাদের উৎসব। এটি একটি নৃত্য-নাটিকা রূপে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান কালে এই নৃত্যের শুধু দুটি গৌণ রূপ দেখা যায়—সাইরাং এবং উমাং লাইহারাবা। প্রতি বৎসর চৈত্র কিংবা বৈশাখ মাসে 'মাইরা বস্তি' গ্রামে থাংজীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিরাট নৃত্য-উৎসবে আয়োজন হয়। এই উৎসব প্রায় দশ দিন ধরে চলে এবং বহু সংখ্যক নরনারী এতে যোগদান করে। মণিপুরের প্রসিদ্ধ পুরাণ মৈরাং পর্বের কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্য-নাটিকা এককনৃত্য, যুগনৃত্য ও সমষ্টিনৃত্য নিয়ে রূপায়িত। এই কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা বীর খাম্বা ও বীরাঙ্গনা থৈবীকে শিব-পার্বতীর অবতার বলে গণ্য করা হয়। খাম্বা-থৈবীর নৃত্য সহজ ও সরল। নৃত্যের তাল, গতি, অঙ্গবিন্যাস, এবং ভাব বৈচিত্র্যহীন। সমষ্টি নৃত্যগুলিতে একশোর বেশী পুরুষ-নর্তকেরা যোগদান করে। এই নৃত্যগুলি তাদের জোরালো দেহ-সঞ্চালন ও গতির দ্বারা এবং সুন্দর বেশভূষার দ্বারা মনকে খুবই নাড়া দেয়।

লাইহারাবার ক্লাসিকাল নৃত্যরীতি অধুনা লুপ্তপ্রায়। একদা মন্দিরের দেবদাসীরা এই ক্লাসিকাল নৃত্যের ধারা রক্ষা করে আসছিলেন। মণিপুরের বাইরে এই ক্লাসিকাল নৃত্যের খবর, গুরু সূর্য্যবারো সিং-এর চেষ্টাতেই পৌঁচেছে। ভরতনাট্যশাস্ত্রের বিধিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত এই নৃত্য-রীতি, তার নিজস্ব একটি মণিপুরী রূপ সৃষ্টি করেছে; বিশেষ করে বাহুর ও হাতের ছন্দোময় সঞ্চালনে এবং মূল দেহভঙ্গীতে—এই দেহভঙ্গী কথাকলির বঙ্কিম-জানু-ভঙ্গী নয় কিংবা কথকের ঋজু ভঙ্গীও নয়। দুঃখের বিষয় যে মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বিস্তার হবার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্লাসিকাল নৃত্য অবহেলিত ও পরে বিস্মৃত হল। অধুনা-বিরল এই নৃত্য দেখবার সৌভাগ্য যদি হত তাহলে

এই নৃত্যের তালের বৈচিত্র্য, পদক্ষেপের নিখুঁত নৈপুণ্য, অঙ্গভঙ্গীর অপূর্ব সংযম এবং ভাবের ব্যঞ্জনা আমাদের নিশ্চয় বিস্ময়ে অভিভূত করত।

অস্ত্রবিদ্যা হচ্ছে মণিপুরের আর একটি প্রাচীন নৃত্যশৈলী। এই নৃত্য নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে করা হয়। তরবারী-নৃত্য, বর্শা-নৃত্য, যুদ্ধ-নৃত্য প্রভৃতি নৃত্যগুলিতে শক্তির নমীয়তা ও অঙ্গ-সঞ্চালনের তড়িৎগতির নিদর্শন আমরা পাই। দুর্গাপূজার সময়ে "কাকৃপাম্বা" অর্থাৎ কাক মারার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে এই উৎসবেই অস্ত্রবিদ্যার নৃত্যগুলি দেখানো হয়। এ ছাড়া এই নাচগুলি খুব জনপ্রিয় হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক উৎসবের সময়েই তরবারী-নৃত্য, বর্শা-নৃত্য, নকল লড়াই ইত্যাদি নৃত্য হয়ে থাকে।

মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে চলন-গঠন নৃত্যের উদ্ভব। এই নৃত্যটি কীর্তনপ্রধান, কিন্তু এতে নৃত্য এবং নৃর্ত্তের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। কীর্তন গানের সঙ্গে মন্দিরা বা করতাল এবং খোলের সংগতে নৃত্য করা হয়। বেশীর ভাগ পুরুষ-শিল্পীরাই এই নৃত্যে যোগদান করে। মন্দিরা বা করতাল নিয়ে নর্তকেরা অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়ান, দুজন খোল-বাজিয়ে দাঁড়ান দুই প্রান্তে, আর দলের নায়ক দাঁড়ান ঠিক মাঝখানে। মণিপুরী পুরুষদের শরীর সুগঠিত ও সুঠাম এবং তাদের পরিচ্ছদ সাদাধুতী, উত্তরীয় এবং পাগড়ী—যেমন সাদাসিধে তেমনি মনোহারী। মন্দিরা বাজিয়ে কীর্তন গান করতে করতে খোলের বোলের সঙ্গে নর্তকেরা অঙ্গ সঞ্চালন করে। এই ধীর দেহ-সঞ্চালনের ফাঁকে ফাঁকে নায়ক এগিয়ে এসে কতকগুলি দ্রুত ও জটিল পায়ের কাজ এবং চমকপ্রদ ভঙ্গিমা প্রদর্শন করে। এগুলি নৃত্তের—নিছক ছন্দের পর্যায়ে পড়ে। চলন-গঠনে মণিপুরী ক্লাসিকাল নৃত্যের 'আঙ্গিক' কিয়ৎপরিমাণে রক্ষিত হয়েছে। মন্দিরার ধ্বনি একসাথে বেজে ওঠে, নাচের গতি দ্রুত হয়ে চলে আর খোল-বাদকেরা এবার তাদের কলানৈপুণ্য দেখাবার জন্য এগিয়ে আসে। লাফিয়ে নুয়ে ঘুরে এঁকেবেঁকে তারা নৃত্য করে, আর এমন উনমাদনার সঙ্গে তারা খোল বাজায় যে নৃত্য যখন তার পরিণতিতে পৌঁছায় তখন সত্যি সেটি অপূর্ব সুন্দর।

রাসলীলা মণিপুরের সবচেয়ে জনপ্রিয় নৃত্য। বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলা, গান ও নৃত্যের দ্বারা রূপায়িত করে। মণিপুরী রাসের বেশীর ভাগ অংশই ভাগবতের ঐতিহ্য অনুসরণ করে। কুঞ্জ, বসন্ত, মহা ও নিত্য এই চারটি হচ্ছে প্রধান রাস। প্রথম তিনটি কুঞ্জ, বসন্ত ও মহা অনুক্রমে আশ্বিন, বৈশাখ ও কার্তিক মাসগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়। কেবল নিত্য রাসই বৎসরের যে কোনো সময়ে হতে পারে।

রাসলীলা উৎসব সাধারণত রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণভক্তদের কাছে রাসলীলা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং এতে যোগ দিলে আধ্যাত্মিক বৈভব লাভ হয় বলে তাঁদের বিশ্বাস। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্ পুরুষ ও মেয়েরা এই উৎসবে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রিত হন। মেয়েদের রাসনৃত্য শেখান সুবিখ্যাত নৃত্যাচার্যেরা। রাস উৎসবের জন্য বিশেষ একটি গোলাকৃতি মণ্ডপ তৈরী করা হয়। এই মণ্ডপকে রাস-মণ্ডল বলে। বেশ-ভূষা নৃত্য-নাটিকার একটি প্রধান উপকরণ। রাসনৃত্যে গোপীদের সাজসজ্জা ছবির মত সুন্দর।

গীত-গোবিন্দ, কল্পতরু, গোবিন্দ লীলামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে। কীর্তন গান করা হয় রাসলীলা গানের এবং নৃত্যের সংগত করে খোল, মন্দির ও বাঁশী।

ভঙ্গী-পরেঙ্গ নৃত্য দিয়ে রাসনৃত্যের আরম্ভ। পরেঙ্গ শব্দটির অর্থ হচ্ছে একটি গুচ্ছ। প্রাচীন নৃত্যাচার্যের পরিকল্পিত পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পরেঙ্গ—ভঙ্গী, খুরুম, বন্দাবলী, গোষ্ঠ এবং বৃন্নাম পরেঙ্গ নিয়ে রাসনৃত্যের রচনা। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি হচ্ছে লাস্য, এবং শেষের দুটি হচ্ছে তাণ্ডব। এই নৃত্যগুচ্ছগুলির মধ্যে ভঙ্গী-পরেঙ্গই প্রধান। কোনো রাসলীলা উৎসব এই নৃত্যকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নয়। কিংবদন্তি আছে যে ১৬৯৮ শাকাব্দে রাজা ভাগ্যচন্দ্র এই নৃত্যটি রচনা করে শ্রীকৃষ্ণকে উৎসর্গ করেছিলেন।

রাসলীলানৃত্য শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা ঘটনার ছবি আমাদের মনের সামনে ফুটিয়ে তোলে। কখনও দেখি একা বাঁশী বাজাচ্ছেন নির্জন প্রান্তরে, কখনও বা রাধিকার সঙ্গে যুগল-মিলনের আনন্দে তিনি মাতোয়ারা, কখনও বা গোপীদের সঙ্গে তিনি নৃত্যে-বিভোর। লঘুরাসে গোপীরা ঘিরে থাকে শ্রীকৃষ্ণকে খেলাচ্ছলে; মহারাসে তারা খুঁজে বেড়ায় শ্রীকৃষ্ণকে বনে বনান্তরে; অন্তরে তাদের এই প্রার্থনা যে তিনি যেন তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করছেন আর প্রতিটি গোপী মনে করছে যে সে একাই শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য-সহচরী। এ ছাড়া পুষ্পচয়নের, জলকেলীর ফাগ-খেলার ও বসন্তঋতুর কতগুলি সুন্দর সুন্দর নৃত্যও আছে।

কার্তিক মাসের শেষাশেষি গোষ্ঠাষ্টমি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। গোষ্ঠ-লীলার নৃত্যগুলি শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবালকদের লীলা নিয়ে রচিত। এই উৎসবের নৃত্যগুলি গোষ্ঠপরেঙ্গ এবং গোষ্ঠ-বৃন্নাম পরেঙ্গ তাণ্ডব পর্য্যায়ে পড়ে। গোপবালকেরা মা যশোদার কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করছে তিনি যেন তাঁর গোপালকে তাদের সঙ্গে খেলবার অনুমতি দেন। তারপর গোপালকে নিয়ে চলে তারা নাচতে নাচতে বনতলে। আবার অন্য কতগুলি নৃত্যে আমরা দেখি—যেমন কালীয়-দমন-নৃত্যে—অমঙ্গল ও অসৎ শক্তির বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম ও জয়লাভ।

ক্লাসিকাল নৃত্য হোক কিংবা অন্য নৃত্যই হোক—প্রত্যেকটি মণিপুরী নৃত্যে দেখি আমরা আনন্দের এবং শক্তির সুসংযত প্রকাশ। মণিপুরী নৃত্যে আছে ছন্দের বৈচিত্র্য, অঙ্গসঞ্চালনের কমনীয়তা ও আবেগের তড়িৎ গতি ও অন্তরের উৎকণ্ঠা। নৃত্যের প্রতিটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ-বদ্ধ এবং সমগ্র নৃত্যটি সৌন্দর্যের আলোকে এমনই উদ্‌ভাসিত যে দেহগত সৌন্দর্য্যের সীমানা পেরিয়ে সেই নৃত্য আমাদের পৌঁছে দেয় সুন্দরের অন্তরলীন রূপলোকে।

একটি প্রাক্-শারদীয় কাহিনী

ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বারো বছরের মেয়ে মঞ্জু বলল : এবার পুজোর কাপড় দেবে না, বাবা ?

—হাঁ, মা, দেব।

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে মঞ্জু আবার বলল : গেল বারের মত আবার ওই মোটা সাড়ী এনোনা যেন। ঐ বাড়ীর ইলার মত জংলী সাড়ী চাই।

তিনকড়িবাবু মৃদু হেসে বললেন : তাই দেব।

মঞ্জুর দু'চোখ আনন্দে নেচে ওঠে। ইচ্ছে হয়, এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে পাড়ার বান্ধবী মহলে সংবাদটা দিয়ে আসে।

পাঁচ বছরের ছেলে পল্টু বলে ওঠে : আমায় দেবে না, বাবা ?

—নিশ্চয় দেব।

—লোটনকে ?

—হ্যাঁ, তাকেও দেব। লাল টুকটুকে দেখে জামা কিনে দেব।

দু'বছরের ছেলে লোটনকে বুকে নিয়ে গৃহিণী বিছানার একপাশে শুয়ে এতক্ষণ শুনছিল, এবার ফোঁস্ করে উঠল। বলল : ছাই দেবে। এক ফোঁটা দুধ জোগাতে পারে না, আবার জামা-কাপড় দেবার সাধ! অসুখে অসুখে ছেলেটা ন্যাতা হয়ে গেল—।

তিনকড়িবাবু অপ্রস্তুত হেসে বললেন : বোনাসের একটা এরিয়র এবার পাওয়া যাচ্ছে কিনা, মিলে গেলে প্রায় শ'তিনেক টাকা।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল : থাক থাক, আমার ঢের জানা আছে। ফি-মাসেই শুনছি ঐ এক কথা!

প্রতিবছরই পূজার প্রাক্কালে এমন এক একটি গুজব উঠে সারা অফিসটা দিনকয়েক সরগরম করে তোলে। দিন কয়েক এ নিয়ে বেশ হৈ চৈ হয়, তারপরই আবার সব চুপচাপ। তেমনি এবারও অফিসে গুজব রটে গেছে, গত দু'বছরের বকেয়া বোনাসের টাকা নাকি কোম্পানী মঞ্জুর করেছে। মোট এরিয়র প্রায় শ'তিনেক টাকা। তিনকড়িবাবুর টেবিলের অমরেশও বলেছে ঐ কথা। ছেলেটি আবার ইউনিয়ন-টিউনিয়নও করে।

অফিসে এসেই তিনকড়িবাবু অমরেশকে জিজ্ঞেস করেন : কি হে, তোমাদের ইউনিয়ন কি বলে ?

—কী ?

—ওই এরিয়রের কদ্দুর হল ?

অমরেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে : ধুর্! বেটারা দেবে না।

—তবে ?

—পাঁচ টাকা ডিয়ারনেস স্যাংশন হয়েছে।

—এরিয়র শুদ্ধু দেবে নাকি ?

—নিশ্চয়। না দিলে আমরাও ছাড়ছি নাকি ? আলবৎ দেবে। তিনকড়িবাবু আশান্বিত হয়ে ওঠেন।

পুজোর আর সামান্য ক'দিন বাকী। মঞ্জু এসে ধরল : কই, বাবা, কাপড় কিনলে না ?

—হ্যাঁ মা, কিনবো।

পল্টু বলে : আমার, বাবা ?

—তোমারও।

গৃহিণী খিঁচিয়ে ওঠে : থাক-থাক, হয়েছে। আমার দেখা আছে।

তিনকড়িবাবু আড়চোখে একবার গৃহিণীর দিকে তাকান। মনে মনে ভাবেন, যদি এরিয়রের টাকাটা সত্যি মিলে যায়, তবে গৃহিণীকেও তাক্ লাগিয়ে দেবেন। একখানা বেনারসী না হোক, অন্তত জুৎসই তাঁতের সাড়ী কিনে গৃহিণীর চোখের সামনে তুলে ধরবেন। এখন এরিয়রের টাকাটা পেয়ে যেতে যা দেরী।

অফিসে এসেই তিনকড়িবাবু অমরেশকে শুধান : কি হে, ডিয়ারনেসের কদ্দুর ?

মৃদু হেসে অমরেশ বলে : স্যাংশন হয়ে গেছে। এখন অর্ডার হতে যে কদিন দেরী।

—পাব তো ?

—নিশ্চয়। না দিলে আমরাও ছাড়ছি নাকি ? দিল্লীতে ডেপুটেশন দেব না ?

তিনকড়িবাবু সংশয় কুণ্ঠিতভাবে বলেন : দেখো ভায়া, পুজোর বাজারে কিন্তু ওটাই ভরসা।

এদিকে পুজোর আর সামান্য দেরী। পুজোর কেনাকেটা প্রায় সবারই হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়েরাও অস্থির হয়ে উঠেছে : কই, বাবা, আমাদের জামা-কাপড় কিনলে না ?

—হ্যাঁ মা, কিনবো।

ক্রমে তিনকড়িবাবু নিজেও যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেন। অফিসে এসেই জিজ্ঞেস করেন : কি হে, অর্ডার বেরুল ?

অমরেশ সরোষে বলে : নাঃ, বেটারা দেবে না।

—দেবেনা ? তবে ?

অমরেশ বেশ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয় : ইউনিয়নও ছাড়বে কেন ? একমাসের এড্‌ভান্স আদায় করে তবে রেহাই দিয়েছে। বারো মাসে কোম্পানী ঐ টাকা কেটে নেবে।

তা হোক, টাকা পেলে তিনকড়িবাবু বেঁচে যান। হাত পাতবার রাস্তা কোথাও নেই। বন্ধু-বান্ধব, কো-অপারেটিভ্, ইন্সিওরেন্স্ পলিসি—সর্ব্বত্র দেনার দায়ে মুখবন্ধ। গেল বছর ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকারে ভুলিয়ে রেখেছেন, এবার কিছু একটা না করলেই নয়। খানিকটা আশান্বিত হয়ে তিনকড়িবাবু বলেন: পুজোর আগেই মিলবে তো?

—নিশ্চয়। এর জন্তই তো এড্ভান্স্ আদায় করা। অর্ডার বড়-সাহেবের ঘরে এসে গেছে। এখন বিল্ তৈরী হতে যা কিছু দেরী।

আর মাত্র ছ'দিন বাকী। ছেলে মেয়েরা আবার ধরে বসল: কই বাবা, পুজো যে এসে গেল।

—এ পাড়ার সবার জামা-কাপড় কেনা হয়ে গেছে।

—তোমাদেরও হবে, মা। আজই কিনে আনব।

নিশ্চিন্ত আশা নিয়েই তিনকড়িবাবু সেদিন অফিসে আসেন। বিল নিশ্চয় তৈরী হয়ে গেছে, পুজোর তো মাত্র ছ'দিন বাকী।

এসেই অমরেশকে জিজ্ঞেস করেন: কিহে, বিল-টিল তৈরী হল?

—নাঃ, বেটারা কিচ্ছু দেবেনা। অমরেশ সরোষে বলে ওঠে। তারপর বক্তৃতার ভঙ্গীতে চড়া গলায় বলতে থাকে—দাবী আদায়ের জন্ত চাই আরো সংগঠন-শক্তি, চাই সমবেত প্রচেষ্টা। আজকের এই পরাজয় আমরা মানবো না,—মেনে নিতে পারিনে—।

সামনের চেয়ারেই বসেছিলেন তিনকড়িবাবু। অমরেশের ওজোস্বিনী বক্তৃতার একটা কথাও তাঁর কানে প্রবেশ করছিল না। অস্ফুটস্বরে শুধু একবার বলে উঠলেন—তবে?

অবশেষে পথ অবশ্য একটা মিলে যায়। সন্ধ্যার পর তিনকড়িবাবু চুপিচুপি পাড়ার হরিধন স্থাকরার দোকানে এসে উপস্থিত হন। একটু ম্লান হেসে বলেন: ত্রিশটা টাকা দিতে হবে যে। বড় অসুবিধায় পড়ে—।

ছ'আনির চেন-হারটা ওজন করে বার কয়েক নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করে হরিধন সুতো-বাঁধান চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে বলল: সোনা সবটুকু নেই, অনেক ক্ষয় হয়ে গেছে। তা পঁচিশ টাকা দাম ধরে দিতে পারি।

—বেশ, তাই দাও। তিনকড়িবাবু আশান্বিত হয়ে ওঠেন।

হরিধন আরেক নজর তিনকড়িবাবুর আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে চেন-হারটা লোহার সিন্দুকে তালাবন্ধ করে রেখে দশটা টাকা বের করে হেসে বলল: গেল বারের বাকী টাকাটা এই থেকেই কেটে রাখলাম। হিসেব করলে অবশ্য সুদে আসলে বেশীই হবে।

তিনকড়িবাবু বিমূঢ়ের মত সেদিকে তাকান। কিন্তু প্রতিবাদ করবার মত কোন কথা খুঁজে পান না।

পুজোর জামা-কাপড় নিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। ছোট ছেলেটাও

অবুঝ আনন্দে নাচতে থাকে। বিছানার একপাশে শুয়ে গৃহিণী এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল। সন্ধ্যার পর তিনকড়িবাবুর অতর্কিতে অফিস থেকে এসেই বের হয়ে যাওয়ায় খানিকটা বিস্মিত হয়েছিল। হঠাৎ কি ভেবে বাক্স খুলে কাপড়ের ভাঁজে চেন-হারটা না পাওয়ায় কিছু একটা অনুমান করেছিল বটে, এবার সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

বড় মেয়ে মঞ্জু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল: একি? তুমি কিচ্ছু চিনতে পার না, বাবা। কাপড়ওয়ালা তোমাকে ঠকিয়েছে। সব পুরোনো কাপড় রং করে তোমাকে নুতন বলে চালিয়েছে।

নুতন আর পুরানো জিনিষ তিনকড়িবাবু ভালই চেনেন। অনেক খুঁজে তবে এ জিনিষের সন্ধান পাওয়া গেছে। নতুবা মাত্র দশ টাকায় ছেলেমেয়ের শাড়ী, সার্ট, পেন্ট এ বাজারে আর কে দেবে?

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বড় বড় চোখ করে তিনকড়িবাবু বলেন: তাই নাকি? বলিস কি? মস্ত ঠকিয়েছে তো! যাক্, এ পুজোটা এ দিয়েই চালিয়ে দাও মা, আসছে বার দেখেশুনে ভাল জিনিষ কিনে দেব।

নিজকে আড়াল করবার জন্ত পাশ ফিরতেই দৈবাৎ স্ত্রীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। সমস্ত ছলনাটুকু ধরা পড়ে যেতে যেন থতমত খেয়ে যান তিনকড়িবাবু। পরক্ষণেই নির্ব্বোধের মত অপ্রস্তুত হেসে চুপি চুপি পাশ কেটে যান।

গ্রন্থি

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সন্ধ্যার আকাশে তারা ঝিকমিক্। শান্ত নদীর জলে তারই ছায়া। অনেক আশার আলো ঝলমল্ যেন।

তার জন্যে তুমি ভেবো না বিনতা।—গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে বেড়াতে বৌদি আশ্বাস দেন তাঁর ননদকে।

বয়সের পার্থক্য অনেক বেশি হলেও ভাব কিন্তু খুবই গভীর বৌদি-ননদিনীর মধ্যে। তাই ওদের একজনের কোন কথাই আর একজনের অজানা থাকে না।

তা ছাড়া একই পার্টির কর্মী ওরা। পূরবীদি পার্টির নেত্রীস্থানীয়া। তাঁরই রেক্রুট বিনতা। কিন্তু তবু কেন জানি পুরোপুরি নির্ভর করতে পারছে না বিনতা তার বৌদির কথার ওপর।

বিনতা যে আশংকা করছে তা একেবারে অমূলকও নয়। তার বৌদি পার্টির পূরবীদি। পার্টির লোকেরা তাঁর কথামতো চলে তিনি তার নেত্রী বলে। কিন্তু সংসারের ব্যাপারে দাদার কথাইতো চরম কথা, বৌদির কথা সেখানে নাও থাকতে পারে।

তবে বৌদির কথাই যে বেশি থাকে এও বিনতা লক্ষ্য করে আসছে। তাইতো সে তার মনের কথা খুলে বলেছে বৌদিকে এবং তাঁর কাছে জানিয়েছে তার আবেদন।

কাল একটুও ঘুমুতে পারিনি বৌদি! আজও হয়তো তেমনি ভাবে না ঘুমিয়েই রাত কাটবে।—দুশ্চিন্তার গভীরতা প্রকাশ পায় বিনতার কথায়।

বেশ আজই তোমার দাদার সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। শুধু শুধু কেন এজন্যে মাথা খারাপ করছো বিনতা!

দেখো ভুলে যেও না আবার। তোমার তো আবার সাত রকমের ঝামেলা।—বিনতা অনেকটা আশ্বস্ত হয়েই বলে।

হ্যাঁ ভালো কথা, আসছে কাল আবার মহিলা সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক অনুষ্ঠান। তোমার আর বীথিকার গান গাইবার কথা। সন্ধ্যা করবে আবৃত্তি। চলো ফেরার পথে বীথিকাকে একবার ভালো করে বলে যাই। সে আবার ভুল না করে বসে!

খুব অসম্ভবও নয়। এরই মধ্যে কেমন যেন হয়ে গেছে বীথিকা। বিয়ের পর পরিষদের কটা মিটিং-এই বা সে আসতে পেরেছে?—সংসার পেতে বসবার পর বীথিকার মধ্যে যে বেশ একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তাই সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করে বিনতা।

তা প্রথম প্রথম এরকম একটু আধটু হয়েই থাকে। এ থেকে প্রমাণ হয় না যে বীথিকার আর

কোন আকর্ষণই নেই আমাদের পরিষদের ওপর। তা ছাড়া হঠাৎ কাজের চাপও পড়ে যেতে পারে, ভুল-চুকও হতে পারে।

সে তো সকলের বেলাতেই হতে পারে।—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় বিনতা। বীথিকার পক্ষ নিয়েই যে কথা বলবেন বৌদি সে তার জানাই ছিল। আর বীথিকার ওপর পরিষদ-সভানেত্রীর পার্শিয়ালিটি যে আজকের নয়, অনেক দিনের, সে কথা পাটির কে না জানে? তা নইলে প্রতাপ রায়ের মতো ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হতে পারতো কখনো? সে যা হয় হোকগে। যে হাতছাড়া হয়ে গেছে তাকে নিয়ে তার চিন্তা করে লাভ নেই। সন্দীপন আবার ফস্কে না যায় তাই হবে এখন দেখতে।

বিনতার যা কিছু চিন্তা তা শুধু এই নিয়ে। প্রতাপের সঙ্গে তারই প্রথম খুব ভাব জমে ওঠে। গানে অবশ্যি বীথিকার নাম বেশি তার চেয়ে। কিন্তু দেখতে? তবে প্রতাপ যদি আর সব কিছু বাদ দিয়ে গানের দিকেই বেশি ঝুঁকে থাকে তা হলে আর কিছু বলার ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটাতো শুধু তাই নয়। সভানেত্রী যা চেয়েছিলেন, তাই হয়েছে।

সত্যি অদ্ভুত শক্তি তার বৌদির। গত কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করে আসছে বিনতা। তাকেও তো পূরবীই পাটিতে এনেছেন। তা না হলে এমনি করে বাইরে ঘোরাফেরা করার সুযোগ পেতো কোনদিন সে জীবনে! তার দাদা আনন্দকুমার শিক্ষা-দীক্ষায় যতোই উন্নত হোন না কেন, তাঁর মনোভাবকে ঠিক আধুনিক বলা চলে না। ভাগ্যি পূরবীবৌদি এসেছিলেন তাদের ঘরে, তা না হলে কী অবস্থাটাই না জানি হতো!

পূরবীদি, এখানে কী করছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?—হঠাৎ সন্দীপনের ডাক শুনে চমকে ওঠেন পূরবী। বিনতাও।

আপনি?

ওপার থেকে এইতো সবে এলাম। বালী আর বেলুড়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটা নাইট স্কুল ষ্টার্ট করার সব ব্যবস্থা আজ ঠিক হলো।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আসছে সপ্তাহ থেকেই স্কুল বসবে। আমাদের পার্টির কাজ খুব ভালোই চলবে এখান থেকে আশা করি।

খুব ভালো কথা, খুব ভালো কথা। দেশের বাস্তব অবস্থার দিকে যদি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে হয় তা হলে আমাদের আরো জোরের সঙ্গে কাজ না চালালে চলবে না। এই দেখুন না, একদিকে কীর্তনের আসর, আর একদিকে ভাগবত-পাঠের বৈঠক কেমন জমে উঠেছে। লক্ষ্য করছেন তো, শুধু বুড়ো-বুড়িরাই নয়, অল্প বয়সী সব ছেলেমেয়েরাও এদিকে কেমন ঝুঁকে পড়ছে!—সন্দীপনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন পূরবীদি।

কিন্তু আপনারাও তো খুব মন দিয়েই কীর্তন গান শুনছিলেন মনে হচ্ছিল।—সন্দীপন বিনতার দিকে তাকান এই বলে।

না, আমি গান-টান কিছু শুনছিলাম না।—বিনতা ছোট্ট উত্তর দেয়।

নিশ্চয়ই না, বিনতা নিজের কথাই শুধু ভাবছিল।

আর আপনি ?—বৌদির কথায় একটু লজ্জা পেয়ে কোন রকম চিন্তা ভাবনা না করেই একটা পাল্টা প্রশ্ন করে বসে বিনতা।

ভক্তির ভাণ ও ভাণ্ডামি থেকে এসব ছেলেমেয়েদের মুক্ত করে কী করে বৃহত্তর মানবতার সেবায় এদের নিয়োগ করা যায় আমি সে কথাই ভাবছিলাম।—পূরবী উত্তর দেন।

কিন্তু এ খুব সহজ কাজ নয় পূরবীদি। এদেশের মানুষের মনের গভীরে, তার রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় ভক্তির বীজ। তাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা ব্যর্থ হবে বলেই আমার মনে হয়। তার চেয়ে অনেক কাল ধরে যে কথকতা, যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যম হিসেবে আমাদের দেশে চালু রয়েছে সেগুলোকে আমরা যদি কাজে লাগাই তাতে ভালো বই মন্দ হবে না।

সন্দীপনের কথাগুলো বেশ মনে লাগে পূরবীদির। বিনতার তো লাগেই। কিন্তু এই কাজে লাগাবার উপায় নিয়েইতো প্রশ্ন। গঙ্গার ঘাটে পায়চারি করতে করতেই সে প্রশ্নটা তোলেন পূরবীদি।

কেন, এখন তো কাল্‌চারেল ফ্রন্টেই আমাদের আসল কাজ। নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা যতো সহজে সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের কথা প্রচার করতে পারবো আর কোনভাবেই তা সম্ভব হবে না। আর এসব অনুষ্ঠানে বাউল, তরজা, কবিগান প্রভৃতি লোক-সংগীত ও লোক-নৃত্যাদি যতো বেশি থাকবে ততো বেশি লোককে আমরা আকর্ষণ করতে পারবো। কী বলেন পূরবীদি ?—জিজ্ঞেস করেন সন্দীপন।

ঠিক কথা।

আর শুনুন। কীর্তনই হোক আর ভাগবত-পাঠই হোক, আমরা যদি এগুলোকেও আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইন্‌ট্রোডিউস করি তাতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে ? আসল কথা কথা হলো ইন্টারপ্রিটেশন নিয়ে। সেতো আমদের হাতে। কী বলেন ?

নিশ্চয়ই।—পূরবীদি এপ্রিশিয়েট করেন সন্দীপনের কথা।

চলুন, যাওয়া যাক এবার। আমাদের বাড়ি হয়ে চা খেয়ে যাবেন।—সন্দীপনকে চায়ের আমন্ত্রণ করায় বিনতা মনে মনে খুব খুশি হয় বৌদির ওপর।

বৌদি, বীথিকাদের বাড়ি আজ আর নাইবা গেলে!—এখানে ওখানে গিয়ে সময় আর নষ্ট করতে চায় না বিনতা।

কী যে পাগলী মেয়ে, সন্দীপনবাবুকে পেয়ে আর তর সইছে না যেন।

এ আবার কী বলছেন পূরবীদি ?

তা নয় তো কি। বিনতা ভাবছে, বীথিকাদের বাড়ি গেলে আপনার সঙ্গে ওর গল্প করার সময় অনেকখানি নষ্ট হয়ে যাবে। আর জানেন না তো শ্রীমতী যে কী দুশ্চিন্তায় পড়েছে! ওর দাদা এবার বোনের বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছেন, উপযুক্ত পাত্রেরও নাকি সন্ধান সুরু হয়ে গেছে, কিন্তু শ্রীমতীর মন যে কাকে উপযুক্ত পাত্র বলে বেছে নিয়েছে সে তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

না, সে আবার কে ?

কেন, শ্রীযুক্ত সন্দীপনচন্দ্র চন্দ। তাঁকে চেনেন না আপনি! —এই বলে হেসে ফেলেন পূরবী চ্যাটার্জি। বিনতাও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুচকি হাসে।

ঐ দেখছেন পূরবীদি, কেমন একমনে নৌকোর মাঝি-মাল্লারা পর্যন্ত কীর্তন গান শুনছে। —কথার মোড় ঘুরিয়ে এক সারি খড়বোঝাই নৌকোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সন্দীপন।

প্রায়ই এমনি সারি সারি খড়ের নৌকা ভিড় করে থাকে বাগবাজারের ঘাটে। সন্ধ্যার সময় মাঝি-মাল্লারা নৌকোবোঝাই খড়ের গাদার ওপর বেশ আঁটসাট হয়ে বসে বিশ্রাম করে, তামক খায় আর এমনি গান বাজনা শোনে। কীর্তন জাতীয় গানে তো এরা একেবারে মেতে যায়।

সন্দীপনের কথায় পূরবী ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখেন মাঝিদের দিকে। মাঝিরা কেউ তামাক টানছে। কেউ বিড়ি। এক একটা করে লণ্ঠন জ্বলছে এক এক নৌকোয় তাদের সামনে। কীর্তনের সুরে আর কীর্তনের কথায় তারা যে কেমন মেতে উঠেছে তা তাদের মুখভঙ্গিতে ধরা পড়ে ঐ লণ্ঠনের আলোয়।

ততক্ষণে গঙ্গার ঘাট থেকে বাগবাজার ষ্ট্রীটে এসে পড়ার পথটুকুতে আর পা ফেলার জায়গা নেই। এমনি ভিড়। কালী, শীতলা, শনি প্রভৃতি নানা ঠাকুর-দেবতার মূর্তি নিয়ে বসেছে এক-একজন পূজারী আর সে সব মূর্তির সামনে জমেছে অসহায় মানুষের ভিড়। কিন্তু অসহায়তার এই যে আর্তি আর আকূতি তার কি কোন প্রতিকার সম্ভব এ ধরণের কর্মহীন নিরর্থক প্রার্থনায় ? আর পূজার নামে এই দোকানদারিই বা কতোকাল চলবে ? পূরবী বিরক্তি প্রকাশ করেন পথ এগোতে এগোতে আর এসব প্রশ্ন করেন আপন মনে।

ভক্তির দেশ এই ভারতবর্ষ থেকে একদিনে এসব কুসংস্কার দূর করা যাবে না, পূরবীদি! এর জন্যে চাই ব্যাপক শিক্ষার প্রসার, চাই প্রচুর পরিশ্রম, পরিকল্পনা আর অর্থ। এদের ওপর বিরক্ত হয়ে কি লাভ ?—

এমনি সব আলোচনা করতে করতে বাগবাজার ষ্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলেন ওঁরা তিন জন।

এ যে অবাক কাণ্ড! বীথিকা আর প্রতাপ নয় ? দূর থেকে এক শাঁখারির দোকানের সামনে এক দম্পতিকে লক্ষ্য করে বিনতাকে জিজ্ঞেস করেন পূরবী।

হ্যাঁ, তাইতো!

এতে অবাক হবার কী আছে পূরবীদি ?

একটু আছে বৈকি ? সমস্ত রকমের সংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেখেছি যে বীথিকাকে আর প্রতাপকে তারা কিনা নিজে থেকেই সংস্কারের বলি হয়ে উঠলো।

ততক্ষণে নতুন একজোড়া শাঁখা পরা হয়ে গেছে বীথিকার। প্রতাপ ছুটো টাকা বের করে দেয় মনিব্যাগ থেকে তাও চোখে পড়ে।

কিরে বীথিকা, শাঁখা পরা হয়ে গেল ? —পিঠে আকস্মিক মিষ্টি চাপড় আর পূরবীদির কণ্ঠস্বর চমকে দেয় বীথিকাকে।

হ্যাঁ, নইলে শাশুড়ীর তাড়নায় বাড়িতে টেকা দায়। —টিপ করে পূরবীদিকে একটা প্রণাম করে বলে বীথিকা। প্রতাপ হাতজোড় করেই সবাইকে নমস্কার জানায়।

ও তাই নাকি! খুব জোর সংসার করছিস্ তুই তাহলে। তা বেশ। কিন্তু কালকের ফাংশনের কথা যেন ভুলে যেয়ো না। চিঠি পেয়েছ তো?

হ্যাঁ, পেয়েছি।

তোমার কিন্তু কয়েকখানা গান গাইতে হবে। বিনতাও গাইবে। ভালোভাবে তৈরী হয়ে নিও। প্রতাপ যাবে বুঝলে।

আচ্ছা।

নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি তা হলে। তোমাদের বাড়ির দিকেই আমরা যাচ্ছিলাম তোমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে কালকের অনুষ্ঠানের কথা। পথে দেখা হয়ে ভালোই হলো। —এই বলে পূরবী বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেন সদলে আর বীথিকারা এগোয় গঙ্গার দিকে। ওরা একটু দেরি করেই বেড়াতে বেরিয়েছে। পথে শাঁখা কিনতেও খানিকটা সময় গেল।

হাতে নতুন শাঁখা, কপালে এই বড়ো সিঁদুরের ফোঁটা, বীথিকাকে বেশ মানিয়েছে কিন্তু বৌদি! —বিনতা হঠাৎ বলে ফেলে।

পূরবী একটু মুচকি হাসেন সন্দীপনের দিকে চেয়ে।

তারপর কথায় কথায় ওঁরা যখন বাড়িতে ফিরে আসেন তখন রাত আটটা দশ।

শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকের গলিতে পূরবীদের ভাড়া বাড়ি। নীচের তলার দেড়খানা ঘরের ভাড়াটে ওরা। ভাড়া চল্লিশ টাকা।

দেড়খানা ঘর বল্লে চটে যান ভবানন্দ বাড়ুয্যে। তিনি বাড়িওয়ালা। থাকেন ওপরতলায়। তিনি বলেন, দেড়খানা ঘর বল্লে চলবে কেন, সঙ্গে এক চিলতে রান্নাঘর রয়েছে, সিঁড়ির তলায় ঘুঁটে-কয়লার জায়গা দেওয়া হয়েছে, তার কোন দাম নেই বুঝি?—ভাড়াটেরা ন্যায্য কথা বলে না, এই তাঁর অভিযোগ।

কিন্তু অভিযোগ যাই থাক, এ নিয়ে আনন্দকুমারের সঙ্গে কখনো কোন বিরোধ হয়নি বাড়িওয়ালার। আনন্দকুমার নির্বিরোধ মানুষ। অধ্যাপক। একটা ইভনিং কলেজে অধ্যাপনা আর গোটা দুই টুইশানি করে বাইরের কোন ঝামেলায় জড়াবার মতো সময়ও আর থাকে না তাঁর। একটি মাত্র ছেলে। বছর সাত আট তার বয়েস। কার্শিয়াং স্কুলে বোর্ডিং-এ রেখে পড়াতে তার পেছনেই প্রায় শ দেড়েক টাকা খরচ। তবু ভালো, ছেলেটা মানুষ হবে। সেজন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন আনন্দকুমার আর কোন দিকে লক্ষ্য না করে। এই একটি ছেলেই যাতে ভালোভাবে মানুষ হয়ে উঠতে পারে পূরবীও আর দ্বিতীয় সন্তান চায়নি সেজন্য।

কলেজ থেকে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় এগারোটা হয়ে যায় আনন্দকুমারের। এক একদিন তার চেয়েও দেরি হয় পূরবীর। বিনতাও থাকে তার বৌদিরই সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ি পাহারায় থাকে কমলা ঝি।

সেদিন কিন্তু আনন্দকুমার একটু আগেই এসে পড়েন। সবেমাত্র আড্ডা ভেঙেছে বাড়ির। বিদায় নেবার উদ্যোগ করছেন সন্দীপন। গল্পে গল্পে গরম হয়ে উঠেছে যেন বাড়ির আবহাওয়া।

বসুন। —সন্দীপনকে উঠতে দেখে অভ্যর্থনা জানান সদ্যাগত গৃহকর্তা। তিনি তো আর জানেন না কতোক্ষণ সন্দীপন বসে আছেন এখানে। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য চোখে পড়ে চায়ের কাপ আর খাবারের ডিস। অমলেটের টুকরোর ওপর মাছি উড়ছে ভন্ ভন্ করে।

না আমি যাই এখন, অনেক রাত হয়ে গেছে। নমস্কার। —এই বলে সন্দীপন বিদায় নেন আনন্দকুমারের কাছ থেকে।

গেটের আলোটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেছে সন্দীপনদা। একটু দাঁড়ান, আমি যেয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে আসছি। —বিনতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় এই বলে।

না না, আমি নিজেই ঠিক চলে যেতে পারবো। তোমায় আবার কষ্ট করতে হবে না এই নিয়ে। —বলতে বলতে অন্ধকার পথেই পা বাড়ান সন্দীপন। কিন্তু অন্ধকারে তাঁর নিজের চোখের আলোতেই ধরা পড়ে বিনতা এক ছুটে দরজার পাশে যেয়ে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

কালকে আমাদের অনুষ্ঠানে নিশ্চয় আসবেন কিন্তু সন্দীপনদা। —গেটের দরজাটা খুলে দিতে দিতে সন্দীপনকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানাতে ভুল করে না বিনতা। সে নিজেও যে গান গাইবে তাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

নিশ্চয় আসব। —এই বলে বিনতাকে ছোট্ট একটু আদর করে বেরিয়ে যান সন্দীপন। গলি তখন নিস্তব্ধ। রাজপথ জনবিরল।

গেট বন্ধ করে দিয়ে ঘরে ঢুকে দাদাকে যেন একটু বেশি গম্ভীর দেখতে পায় বিনতা।

দাদা তুমি খাবে এখন?

দাও। —ছোট্ট জবাব।

ডাল, ডিমের বড়া আর ভাত। এই তো খাওয়া। মাসের মাঝামাঝি এসে গেলে এর চেয়ে বেশি কিছু আর বড়ো একটা জোটেওনা। তবে সেসব নিয়ে আনন্দকুমার মাথা ঘামান না কোনদিন। কিন্তু চাঁদার কথা শুনে শুনে তাঁর মাথা গরম হয়ে ওঠে সময় সময়। সেদিনও ঠিক তাই হয়েছে।

ছেলের খরচটা পাঠিয়ে দিয়ে বাকি সব টাকাই তো আনন্দকুমার দিয়ে দেন পূরবীর হাতে। সংসার যে ভাবে চলে চলুক তাতে তাঁর কোন আপত্তিই নেই। এ ফণ্ডে, সে ফণ্ডে কোথায় কতো টাকা যাচ্ছে না যাচ্ছে তার কোন হিসেবই তিনি কোনদিন জানতে চাননি। তারপরেও যদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে তাঁর কাছে ভিন্ন করে আবার টাকা চাওয়া হয় তাহলে শুরু গম্ভীর হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কীই বা করবেন আনন্দকুমার? আর যাই হোক ঝগড়া-ঝাঁটি করা তাঁর কাজ নয়, এ সবারই জানা।

আর সামান্যই টাকা আছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তা থেকে কিছুটা খরচ হয়ে যাবেই। বাকি টাকায় মাসের বাকি কটা দিন চালানো অসম্ভব, এটুকুই গৃহকর্তাকে জানাতে চেয়েছিলেন

পূরবী। আরো অল্প কিছু টাকা চেয়েছিলেন তাঁর কাছে। তাতেই যে ঘরের আবহাওয়াটা কিছু উত্তপ্ত তা একটু পরেই টের পায় বিনতা।

আরো কয়েকদিন পরের কথা। মাস শেষ হতে আর মাত্র দু'টো দিন বাকি।

যথারীতি অনেক রাত্রিতে ক্লান্ত হয়েই ফেরেন আনন্দকুমার। সামান্য বিশ্রামের পর আহারে বসে বেশ কেমন যেন অবাক লাগে তাঁর।

কী ব্যাপার, আজ এতো আয়োজন ?

বেশতো খেয়েই নাও না, পরেই না হয় শুনবে। —চিংড়ি মাছের কালিয়ার বাটিটা সামনে এগিয়ে দিয়ে পূরবী হাসতে হাসতে বলেন আনন্দকুমারকে।

আর কিছুর জন্যে নয়, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি ঘরে যখন এতো অভাব চল্‌ছে সেই মাসের শেষে কী করে তুমি এই ব্যবস্থা করলে ? কোথায় পেলে টাকা-পয়সা ?

বারে, বিনতার আজ বিয়ে হয়ে গেল, একটু আনন্দ করবো না বুঝি ! নাই বা থাকলো টাকা-পয়সা তা বলে বিয়ে-বাড়িতে একটু বিশেষ আয়োজন হবে না খাওয়াদাওয়ার ! তোমার ভগ্নিপতি সন্দীপন চন্দ্রই আজকের এসব খরচপত্র করেছেন।

পূরবীর ঘোষণায় কিছুক্ষণ যেন তাজ্জব হয়ে থাকেন আনন্দকুমার। খাওয়া শেষ করে উঠতেই সামনে দেখেন সন্দীপন আর বিনতা।

বিনতার কপালে বড়ো লাল সিঁদুরের ফোঁটা। আনন্দকুমারের আরো বড়ো বড়ো দৃষ্টি পড়ে সেই সিঁদুর চিহ্নের দিকে।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও ৪১, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ সার্ভিস্‌ প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত।

"Gold Crust" Bread

MANUFACTURED BY GREAT EASTERN HOTEL

By the only and most modern automatic bakery Plant in India

"Gold Crust" Bread better than ordinary Bread

•

GREAT EASTERN HOTEL, BAKERY,

1, 2, & 3, OLD COURT HOUSE STREET,
CALCUTTA

THE ANDHRA INSURANCE COMPANY LIMITED.

Head Office : MASULIPATAM.

Estd. 1925

ANDHRA marches forward with a sound and steady record of satisfactory service and with an unassailable financial standing.

Total Business in force exceeds .... Rs. Ten Crores
Total Assets exceed .... Rs. Two Crores
Total Annual Income exceeds .... Rs. Sixty Lacs.

Transacts LIFE, MOTOR, MARINE and all other Classes of Insurance

Mr. D. Subrahmaniam, M.A., F.I.A.F.S.S (Lond.) A.S.A.
General Manager

Our Calcutta Office
ANDHRA INSURANCE BUILDINGS,
12, Chowringhee Square, Calcutta

K. K. Mitter, *Reg. Manager*
J. N. Jha, *Life Br. Manager*

Also Offices at :

Madras, Bombay, Nagpore, Delhi, Bangalore, Belgaum, Anantapur, Secunderabad, Bhubaneswar, Ernakulam, Bezwada, Rajahmundry, Jamshedpure, Vizagapatam, Dibrugarh, Muzaffarpur, Allahabad, Ahmedabad, Warrangal, Karimganj etc.